

Ananda Varita

BENGALI & ENGLISH



Vol. VII

May, 1959

No. 1

Ananda Varta

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and other religio-philosophical topics.



Board of Editors



Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M.A., D, Litt.

Kumari Lalita Pathak, M.A.,

Kumari Padma Misra, M.A., Acharya.

Kumari Bithika Mukerji, M.A., D, Phil.

Br. Atmananda,

Sri Sailesh Brahmachari.

Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M.A., B.L.,

Sri K. Bose—*Managing Editor.*

* * * * *

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5·00

Foreign—Rs. 6·00 or 10 shillings or dollar 1·25 only.

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

The magazine is published in three separate editions—Hindi-English ; Bengali-English ; purely English—in the months of May, August, November and February. The year begins from May.

Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money orders or Postal orders.

Complaints about non-receipt of the magazine should be sent to this office *latest by the second week*.

All correspondence regarding 'Ananda Varta' should be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U.P.).

Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

Contents

BENGALI SECTION

	Page No-
1. মাতৃবাণী— ...	1
2. শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত ...	3
3. শ্রী শ্রীমা আনন্দময়ী—শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় ...	21
4. নামাবলী — ...	22
5. আনন্দম্— ...	33
6. ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা—শ্রী গুরুপ্রিয়া দেবী ...	35
7. মা হারিয়ে মা পেয়েছি—গোপাল ...	41
8. মায়ের জন্মদিনে—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী ...	49
9. ষট্চক্রভেদের পরাবস্থা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট ...	51
10. চিঠি— ...	56

Contents

ENGLISH SECTION

	Page No.
1. Matri Vani ...	1
2. Shree Anandamayee—Swami Sivananda ...	6
3. Ananda Tattva—Dr. Rama Choudhuri ...	7
4. The Malady of the Age and its cause and cure—Dr. B. L. Atreya, M.A., D. Litt. ...	11
5. The way to Sri Krishna—Dr. M. Hafeez Syed, M.A., Ph. D.; D. Litt. ...	20
6. God Intoxication—Swami Ramdas ...	23
7. Ādal—Dr. T. M. P. Mahadevan, M.A., Ph. D.	25
8. Reminiscences—Atmananda ...	30
9. Matri Lila ...	36
10. Notes and Comments ...	39



ĀNANDA VĀRTĀ

অমর আত্মা—অমর পন্থি স্বয়ম্ আপনাতে আপনি।

VOL. VII] BIRTHDAY NUMBER. MAY 1959 [NO. I

—মাতৃ-বাণী—

:(বিভিন্ন লোকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীমা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন
উহার সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন)

মানুষের জীবন নিজকে পাওয়ার দিকই হওয়া উচিত। নিজকে পাওয়া
মানে ভগবানকে পাওয়া। যেদিন যায় সে দিন আর ফেরে না। অমূল্য সময় নষ্ট
করতে নাই।

*

*

*

*

সত্যলাভের ইচ্ছাই মানুষের দিক হওয়া উচিত। নিত্য গুরুদত্ত ক্রিয়ায়
ব্রতী থাকাই আলো পাওয়ার পথ। আবেদন নিবেদন যাহা সর্বদা তাঁহার
কাছেই করা।

*

*

*

*

চব্বিশ ঘণ্টা ভগবৎ ভাবের পরিবেশে মনকে রাখতে হয়। তা হলেই
প্রকাশের আশা। কোন মুহূর্তে তিনি প্রকাশ হবেন। তাই সর্বদা নিজেকে
জাগ্রত রাখা।

*

*

*

*

আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী সকলে রাস্তা খুঁজে নিচ্ছে। যা শ্রেয় তা*

গ্রহণ—প্রিয় ত্যাগ মানুষের কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ পথ যা সেই পথে চলার দিক নেওয়া কর্তব্য। প্রকৃত যা সত্য পরম শান্তি ও পরম আনন্দের দিক।

* * * *

আত্মদর্শন হবে কি, আছেই ত। তবে শুধু আবরণ নষ্ট হওয়া। নষ্টই বা মানে কি? যা নাশ হওয়ার তাইত নাশ হয়। আবরণ নষ্ট হলে যা তাই প্রকাশ যা নিত্য আছে। স্বয়ম্ স্বরূপ প্রকাশ।

* * * *

পূর্ণ নাই কমি আছে; তাই না পূর্ণ করতে চাও। শরীর কি না—যা সরে যায় পরিবর্তন হয়। দেও দেও না থাকলে সরে যাওয়ার যোগ্য শরীর থাকে না। তাই ভগবৎ প্রকাশের পর এ শরীরের কথা আসে না। স্বয়ম্ প্রকাশ।

* * * *

পুস্তক একটিই আছে। তার মধোই সব। সে পড়া হলে আর কিছু বাকী থাকে না। স্বধন লাভের জন্তই সাধন করা।

* * * *

যে চিন্তায় মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে ও ভগবান থেকে দূরে নেয় তাই হুশ্চিন্তা। হুশ্চিন্তা যাতে মনে স্থান না পায় তাই চেষ্টা করা। তোমার ভার সব ভগবানের উপর। সেই বিশ্বাস নিয়ে সরলতা ও মনের স্মৃতিতে থাকবার চেষ্টা করবে।

* * * *

নিজেকে পাওয়ার দিকই একমাত্র দিক। আর সব বৃথা ও ব্যথা।

* * * *

মায়ের সঙ্গে যে নিত্য সম্বন্ধ—চিরপরিচিত এক আত্মাই তো।

* * * *

মহা ঔষধ একমাত্র ভগবৎ চিন্তা। ইহাই সর্বদা স্মরণ, সেবন, সকলেরই প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

(পূর্বানুসৃত্তি)

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

৯ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৩৫৪১১) সকাল বেলা হইতেই শ্রীশ্রীমায়ের সহিত ভক্তদের গোপন কথা চলিতেছে। হাড়দরাবাদ আশ্রম প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল ভক্তলোক এখানে নূতন আসিয়াছেন তাঁহারা মার সঙ্গে একান্তে আলাপ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজই চলিয়া যাইবেন।

বিকাল বেলা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মহাশয়ের আশ্রীয়া কয়েকটি মহিলা মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা জাগতিক অশান্তির কথা তুলিলে মা বলিলেন, “দেহ ভাব লইয়া থাকিলেই অশান্তি। জাগতিক জিনিষের স্বভাবই অশান্তি দেওয়া। সেইজন্য স্বভাবের কাজ, ভগবানের কাজ লইয়া থাকিতে হয়। লোক-সেবা ইত্যাদি কাজও খুব ভাল। তাহাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। কিন্তু খণ্ডভাবে সেবা করিলেও শান্তি পাইবার উপায় নাই। দুই থাকিলেই ঝগড়াঝাটি, অশান্তি থাকিবে। অখণ্ডভাবে কাজ করিলে, কেবল তাঁহার উদ্দেশ্যে কাজ করিলে, তাঁহার কৃপায় জ্ঞানগঙ্গা আসিয়া যখন সমস্ত বাসনা এবং সংশয় ধুইয়া মুছিয়া দিয়া যায়, তখনই শান্তি।”

এ মহিলাদের মধ্যে একজন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উন্মাদ রোগের ঔষধ প্রার্থনা করিলে মা বলিলেন, “আমার নিকট একটি মাত্র ঔষধ আছে তাহার কথা ত তোমাদিগকে বলিলাম। এ দেহ কাহাকেও কোন ঔষধ দেয় না। কর্মফলের জন্যই জাগতিক ভোগ হয়। এ ভোগও মঙ্গলের জন্য। দুষ্ট ছেলেকে শিক্ষা দিতে মা যেমন শাসন করেন, এ জাগতিক ভোগও সেইরূপ। জীবকে ভগবদমুখী করিবার জন্যই এ সব ভোগ হয়। তাই আমি বলি যে, সর্বদা তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ধ্যান হইতেই লোকের পরম শান্তি হয়।”

এইরূপ অনেক কথাই মা বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইহারা চলিয়া গেলেন।

আজ প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গঙ্গোত্রী রওনা হইয়া গেলেন। অনেকেই তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত এবং বয়সও তাঁহার পঞ্চাশের উর্দ্ধে। তথাপি তাঁহার স্বভাব বালকের মত। কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় তিনি চীৎকার করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিতেন যদিও ঐরূপ করিবার কোন সঙ্গত কারণ থাকিত না। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মন্থথবাবু অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, “মহাশয়, আমরা কেহই কানে খাট নই। আপনি আস্তে আস্তে কথা বলুন।” মা বলিলেন, “বাবাজী যেমন জোরে কথা বলিয়াছে আমিও সেইরূপ জোরে কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাবাজী একা একা থাকিতেই ভালবাসে। বালানন্দ স্বামীর আশ্রমে বাবাজীকে রাখিবার জন্য প্রাণগোপালবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বাবাজী রাজী হয় নাই। সে বলিয়াছে, ‘আমি কোন বন্ধনের মধ্যে আসিতে চাই না।’ কি করিয়া যে বাবাজী এতদিন এই হট্টগলের মধ্যে রহিল তাহাই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। গ্রামে গুড়া-বুড়া সকলেই তাহাকে এক একটা খোঁচা দিয়া কথা বলিত। বাবাজী ইহা সহ্য করিয়াই বাইত এবং বলিত, ‘খোঁচা দেওয়া মোজা, কিন্তু সহ্য করা কঠিন।’ মাত্র একদিন সে দুইবার রাগ করিয়াছিল। তাহাও অভয়ের উপর। সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া যায় আর কি! মন্থথবাবু প্রভৃতি অনেক অনুরোধ করিয়া বাবাজীকে শান্ত রাখে। রাগ করিয়া যে বাবাজী অস্থায় করিয়াছে তাহাও বাবাজীর মনে মনে ছিল। একদিন কলের নীচে স্নান করিতে গিয়া বাবাজী পর পর দুইবার মাথার একই স্থানে আঘাত পায়। উগ্ৰ হইতেই তাহার স্মরণ হইয়াছিল যে, এই শাস্তি ভোগ তাহার ঐ রাগ করার জন্য। তাই সে বলিত, ‘এত মন্দ নয়, রাগ করিলে মাথা ফুটা হইবে, আর শান্ত হইয়া থাকিলে লোকে কান ধরিয়া ঘুরাইবে।’ এই ঘটনার কথা আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট হইতেও শুনিয়াছি। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘একই স্থানে একই ভাবে পর পর দুইবার আঘাত পাওয়া আমি যে কেবল আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করি

তাহা নয়, উহা আমার কাছে একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। আর আঘাতও কি আঘাত, একেবারে রক্তপাত!”

ভূপতিবাবু আজ বিকাল ৬ টায় ঢাকা রওনা হইবেন। তল্লিতল্লা বাঁধা হইয়াছে। টাঙ্গাও আসিয়া উপস্থিত। এখন মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইবেন। ভূপতিবাবু মাকে প্রণাম করিলে মা হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আসিলেই যাইতে হয়, যাওয়ার অর্থ ই আবার ঘুরিয়া আসা।” বাড়ীতে পৌঁছিয়া কাহাকে কি বলিতে হইবে তাহাও কিছু কিছু মা বলিয়া দিলেন। গুরুজনকে প্রণাম করিয়া ভূপতিবাবু টাঙ্গায় উঠিয়া বসিলেন। টাঙ্গা ছাড়িয়া দিল।

ভূপতিবাবু চলিয়া যাইবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে শ্রীশ্রীমা নীচে নামিয়া আসিলেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, “টাঙ্গা চলিয়া গিয়াছে নাকি? এত শীঘ্রই চলিয়া গেল?” আমি বলিলাম, “গাড়ী ৭৭ টায় ছাড়িবে। টাঙ্গাতে যাইতেও কিছুক্ষণ লাগিবে, কাজেই ভূপতিবাবু খুব আগে স্টেশনে যান নাই ত।” মা চুপ করিয়া রহিলেন।

মা আজ নীচের ঘরে শুইবেন, উপরে মায়ের ঘরে মনোমোহন এবং আমাকে যাইয়া শুইতে বলা হইল। আমরা আমাদের বিছানাপত্র উপরে রাখিয়া মার কাছে আসিয়া বসিলাম। এমন সময় মাকে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইল। শুনিলাম মা মোটর গাড়ীতে দেরাছন গেলেন। তখনই সন্দেশ হইল মা বোধ হয় ভূপতিবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলেন।

আহারান্তে যখন মার কাছে গিয়া বসিলাম তখন রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে। দেখিতেছি এখানে দিনে রাত্রে তিনবার করিয়া পাঠ হইতেছে—সকাল বেলা ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত, বিকাল বেলা ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রি ৯টা কি ৯টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত। এই পাঠের সম্বন্ধে মা আমাকে বলিলেন, “এরা সকলে বলে যে আমি পাঠের নিয়ম করিয়াছি, কিন্তু তাহা নয়। যাহা হইবার তাহা আপনা হইতেই হইয়া যাইতেছে। তুমি শচীনকে ত চেন, সে একবার আমাকে বলিল, “মা, আমাকে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত কিনিয়া দিও, আমি উহা পাঠ করিব।” শুনিয়াছিলাম কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের ভাষা খুব

শক্ত, অল্প লেখাপড়া জানা লোকের পক্ষে উহা বুঝা সম্ভব নয়। আমি শচীনকে বলিলাম, “তুমি কি উহা বুঝবে?” ইহার পরই মহানন্দ (ব্রহ্মচারী) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত লইয়া আসিল। তখন ঠিক হইল যে ঐ মহাভারত রোজই কিছু কিছু পাঠ হইবে। পরমানন্দই পাঠ আরম্ভ করিল। সে বেশ নিয়ম মতই পাঠ করিত। কাজের চাপ থাকিলেও সে উহার মধ্যে সময় করিয়া নিত। আর তখন শ্রোতাদের পাঠ শুনার কি উৎসাহ! পাঠ শুনিবার জন্য ছুটাছুটি পড়িয়া যাইত। উহা দেখিয়া অভয় বলিল যে সেও কিছু পাঠ করিবে। এই ভাবে তিন বেলা পাঠ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এখন পাঠে আর সে রকম উৎসাহ দেখা যায় না।”

মা নেপাল দাদাকে পাঠ করিতে বলিলেন এবং অধীত বিষয় হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে বলিলেন। কারণ শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকেই বাংলা জানেন না। আজ শ্রোতাদের মধ্যে ত্রীযুতা সেবাকে দেখিলাম। মা তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, “কাল পাঠের সময় সেবা বিমাইতে ছিল। সে আমাকে বলিয়াছে যে পাঠ শুনিতে গেলেই তাহার ঘুম পায়, কারণ যাহা পড়া হয় তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। সেইজন্য আজ হিন্দীতে অনুবাদ করিতে বলিলাম।”

নেপাল দাদা মাকে প্রণাম করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন। মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল এবং তিনি উহা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন। পাঠ এবং অনুবাদ সুন্দর হইতেছিল। এইরূপে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ চলিল।

পাঠ শেষ হইলে নানা কথা চলিতে লাগিল। মা বলিলেন, “ষ্টেশনে যাইয়া দেখি যে ভূপতি বাবা গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। একটু ষ্টেশনে বেড়াইয়া আসিলাম।”

আমি। ইহা আমরা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছি।

মা। কেমন করিয়া করিলে?

আমি। তুমি উপর হইতে নামিয়া আসিয়া ভূপতিবাবু চলিয়া গিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তারপর শুনিলাম যে মোটরগাড়ীতে তুমি দেৱাহনের দিকে গিয়াছ, তখন মনে হইল যে, ভূপতিবাবু সম্বন্ধে তোমার যখন একবার খেয়াল হইয়াছে তখন বোধ হয় তুমি ষ্টেশনে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে।

মা। আমি যখন উপর হইতে নীচে আসি তখন খেয়াল হইয়াছিল যে, এই সময়ই ত লক্ষ্মী দেখা করিতে আসে। সে যদি মোটরগাড়ী লইয়া আসে তবে ষ্টেশনে যাওয়া যায়। বাস্তবিক তখনই কিন্তু ভূপতির সহিত দেখা হইয়া গিয়াছে।

আমি—তবে আবার নীচে আসিয়া টাঙ্গা চলিয়া গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে কেন?

মা—তাহা না হইলে বলিব কি? কথা বলা ত চাই। আমি কি জানি না যে ভূপতি আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিল এবং তাহার অনেক পরে আমি উপর হইতে নীচে আসিলাম। এতক্ষণ ভূপতির থাকার কথা নয়। তবুও প্রশ্ন করিলাম। এ কেমন জান? এ যেন জ'নার মধ্যে আজানা ভাব। সেদিন বলিতেছিলাম না যে, আমি এখনও যেমন আছি, ছোটবেলায়ও সেইরূপ ছিলাম; তবুও এট দেহের উপর দিয়া যখন সাধনার অবস্থাগুলি হইয়া যাইতেছিল তখন কেমন যেন একটা অজ্ঞানতার ভাব। ইহাও সেইরূপ।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন, “তোমরা যাহাকে মিথ্যা বল, আমার ঐ জাতীয় কথা কিন্তু তাহা নয়। কোন জিনিষকে এক ভাবে জানিয়া উহা অন্য ভাবে প্রকাশ করাকে মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কথা বলিলে তাহা মিথ্যা হয় না। কারণ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়া যে কথা বলা যায় তাহা সেই অবস্থায় সত্য।”

রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া আমরা মাকে প্রণাম করিয়া শয়ন করিতে চলিয়া আসিলাম।

একান্তে সংযম শিক্ষা দরকার কি না

১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৪৮ (ইং ২৪।৫।৪১) প্রত্যহ। যেক্রপ সকালবেলা পাঠ হয় আজও তাহা হইল। নেপালদাদা আশ্রমের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া পাঠ করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমা সিঁড়ির কাছে একটি আসনে বসিয়াছিলেন। এমন সময় এতদেশীয় কয়েকজন মহিলা ফল ইত্যাদি লইয়া মার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া ফলের বুড়িটা মার কাছে রাখিলেন। মা

একটু হাসিয়া বুড়িটা নেপালদাদার সম্মুখে রাখিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, “পাঠকের কাছেই ফলগুলি রাখ। দেখি পাঠকের মন কোন্ দিকে যায়।” মার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। নেপালদাদা হাসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা কি ছেলেকে লোভ দেখাইয়া পরীক্ষা করে? লোভের জিনিষ সম্মুখে রাখিলে ছেলে যদি সংযম রাখিতে না পারে?”

মা। পারিবে বলিয়াই ঐরূপ রাখা হইয়াছে।

নেপালদাদা। লোভ হইতে দূরে থাকা কি ভাল নয়?

মা। সংযমের প্রথম অবস্থায় দূরে থাকা ভাল, কারণ তাহা না হইলে paralysis হইতে পারে, (অর্থাৎ অবশ হইয়া ইন্দ্রিয়ের ইচ্ছামত কাজ হইতে পারে) পরে একটু শক্ত হইলে লোভের জিনিষ সম্মুখে রাখিয়াই সংযমের চেষ্টা করিতে হয়। লোভের জিনিষ দেখিলেই যে পালাইতে হইবে এই বা কি কথা? আর পালাইয়া জঙ্গলে গেলেই বা অব্যাহতি কই? সেখানেও ত হঠাৎ লোভের জিনিষ যাইয়া উপস্থিত হইতে পারে। সর্বাবস্থায় এক লক্ষ্য থাকিতে চেষ্টা করা উচিত। সকল রূপেই যে তিনি,—এই ভাব থাকা চাই এবং এই জ্ঞান হইলেই নিশ্চিন্ত।

নেপালদাদা। কি করিয়া বুঝিব যে শক্ত হইয়াছি?

মা। যখন ফল পাকে তখন বুঝাইয়া দিতে হয় না। উহার রং এবং গন্ধ হইতেই সব প্রকাশ পায়।

আবার পাঠ চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মা ফলগুলি কাটিতে ইঙ্গিত করিলেন। “বাচ্চার ভুখ্ লাগিয়াছে, সবুর সহে না” বলিয়া দুই তিনজনকে ঐ কাজে লাগাইলেন। ফল কাটা হইলে অতি সামান্য নিজে গ্রহণ করিয়া উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দিতে বলিলেন। প্রসাদ বিতরণের ভার সাধন ব্রহ্মচারীর উপর পড়িল। এ জাতীয় কাজে তাহার বিশেষ উৎসাহ নাই। মায়ের আদেশ বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে এই কাজ করিতে হইল। মা হাসিয়া বলিলেন, “যে যাহা করিতে চায় না আমি তাহাকে দিয়াই তাহা করাই।”

পাঠ শেষ হইলে আমরা মধ্যাহ্নের আহার করিতে গেলাম। শ্রীশ্রীমা ঐখানে বসিয়াই আগন্তুক মহিলাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

বেলা ২টার সময় থুকুনী দিদি আমাকে বলিলেন, “মিরাট যাইবেন নাকি ? মা আজ বিকালে মিরাট যাইবেন।” আমি বলিলাম, “তবে আমরাও আজ কলিকাতা রওনা হইব। হট্টগোল আমার ভাললাগে না।” পরমানন্দ স্বামীজী বলিলেন, “ছুপুরবেলা মা একবার আপনাকে ডাকিতে বলিয়াছিলেন। পরে আবার নিজেই বলিলেন, “এখন ডাকিয়া কাজ নাই, আমরা রওনা হইবার সময় বাবাজীদিগকে ডাকিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেই হইবে।” বুঝিলাম আমাদের মতো মিরাটে যাইতে হইবে। তদনুসারে মনোমোহন এবং আমি প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। জিনিষ পত্র সবই রাখিয়া গেলাম, সঙ্গে কেবল কাপড় জামা ও বিছানা লইলাম।

শ্রীযুতা সেবার অবস্থা বর্ণনা

বিকালবেলা শ্রীযুতা সেবা ও আরও কয়েকজন মহিলা শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই মায়ের ঘরে চলিয়া গেলেন। আমরা হলঘরে বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলাম এমন সময় নেপালদাদা আসিয়া আমাকে বলিলেন, “মার ঘরে চলুন একটা মজা দেখিবেন।” মার ঘরে গিয়া দেখি মা বিছানায় বসিয়া হাসিতেছেন। শ্রীযুতা সেবা এবং অগ্ন্যাত্ত মহিলা মার সম্মুখে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া মা বলিলেন, “সেবাকে লইয়া একটু আমোদ করিবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করিয়াছি। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, ‘আজ আমরা মিরাটে যাইতেছি, তুমি আমার নাড়ীটা পরীক্ষা করিয়া দেখ ত এত দূর বাসে যাইতে পারিব কি না?’ যেই আমাকে স্পর্শ করা আর সেবার এই অবস্থা। যে হাতখানা দিয়া সে আমার নাড়ী স্পর্শ করিয়াছিল তাহা এতক্ষণ শূন্যই ছিল। এখন পড়িয়া গিয়াছে। চক্ষু মেলিতে বা শরীর নাড়িতে পারিতেছে না।”

আমি দেখিলাম যে শ্রীযুতা সেবা একখানা নিশ্চল প্রস্তরের মূর্তির মত বসিয়া আছেন। শরীরের কোন স্পন্দন নাই। চক্ষু মুদ্রিত, ধ্যানস্থ অবস্থা।

তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ইনি কি এখন জ্ঞানশূন্য ?”

মা। না, জ্ঞান আছে। যাহা বলিতেছি তাহা শুনিতেছে, কিন্তু চোখ খুলিতে পারিতেছে না।

এই বলিয়া মা হাসিমুখে শ্রীযুতা সেবাকে বলিলেন, “কি তুমি এমনি বসিয়া থাকিবে নাকি ?” তিনি মৃহ মৃহ হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু চাহিতে পারিলেন না। মা আমাকে বলিলেন, “ঐ দেখ, কথা শুনিতেছে, কিন্তু উত্তর দিতে বা চোখ খুলিতে পারিতেছে ন ইহার ভিতর একটুকুও কৃত্রিমতা নাই। যদি আমার কথা উহার কাণে না যাইত তবে মুখে কোন বিকারই দেখিতে না। আবার কথা শুনিলে এবং কথা বলিবার শক্তি থাকিলে অমনি উত্তর দিত। হল করিয়া এ কিছু করিবে না।

এক ভদ্রলোক। এ কি জড় সমাধি ?

মা। ঠিক তা’ নয়। তবে ঐ দিকেরই একটা ভাব।

নেপালদাদা। এরূপ হয় কেন ?

মা। ইহার ভিতর একটা জিনিষ আছে যাহার জন্ম এরূপ হয়। অবশ্য ঐ জিনিষের খবর সেবা নিজেও জানে না। সেবা একেবারেই শিশুর মত সরল। ইহাকে হাসান বা কাঁদান মোটেই শক্ত নয়। ইহারা দুটি বোন। ছোট বেলা হইতেই ইহাদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ইহারা নিজেদের রান্না নিজেরাই করিয়াছে। ঘরের সকল কাজ নিজেরাই করিয়াছে। তবে ছোট বেলা হইতেই সেবার লেখাপড়া শিখিবার খুব ঝোঁক ছিল এবং নিজের চেষ্টাতেই এ লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং চাকুরী করিয়া ছোট বোনকে লেখাপড়া শিখাইয়াছে। কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া একটু জমি ও একখানা বাড়ী করিয়াছে। শেষে ছোট বোনের বিবাহ দিয়াছে। বোল সতের হাজার টাকা খরচ করিয়া যে বাড়ীখানা সে করিয়াছিল তাহাও বোনকে দিয়া দিয়াছে। সেবা বলে, ‘বাড়ীঘর দিয়া আমি কি করিব ? যদি দরকার হয় তবে ভিক্ষা করিয়া খাইব।’ সেবার যে জমিটুকু ছিল, এই বিবাহ উপলক্ষ্যে বরের পক্ষ সের্টুকুও লেখাইয়া লইতে চাহিয়াছিল

এবং সেবাও যে দিতে অনিচ্ছুক ছিল তাহা নয়; কিন্তু তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহা করিতে দেয় নাই। জানই ত বাহার সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন ভগবান তাহাদের একটা ব্যবস্থা করেন।

সেবার এমন সরল বিশ্বাস যে, যদি কেহ তাহাকে কিছু বলে সে নির্বিচারে তাহা বিশ্বাস করিয়া যায়। একটি শ্রীলোকের সহিত সেবার খুব ভাব ছিল এবং সর্বদা তাহার কাছে যাতায়াত করিত। ইহা দেখিয়া আমি সেবাকে বলিয়াছিলাম যে, তাহার পক্ষে গৃহস্থদের সঙ্গে করা ভাল নয়। ইহা শুনিয়া সে আমাকে বলিয়াছিল, “মা, তুমি বল কি? ঐ শ্রীলোকটি আমাকে ‘বোন’ ‘বোন’ বলিয়া কত আদর করে। আর তাহার কেমন ধর্মভাব। সে সর্বদা ভগবানের আলোচনা করে এবং অনেক সময় ধ্যানস্থ হইয়া থাকে। তাহার কাছে গেলে আমার ক্ষতি কি?” ইহা শুনিয়া আমি তাহাকে আর কিছু বলিলাম না। যদি স্পষ্ট করিয়া তাহার কাছে যাইতে নিষেধ করিতাম তবে সেবা হয়ত সরল ভাবে তাহাকে বলিয়া দিত যে আমি তাহার কাছে যাইতে তাহাকে নিষেধ করিয়াছি। ইহাও ত ভাল নয়, কারণ ইহাতে ঐ শ্রীলোকটির মনে কষ্ট হইতে পারে। কিন্তু কিছুদিন পরে যখন ঐ শ্রীলোকটির সন্তান সম্ভাবনা হইল তখন সেবার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। অবশ্য ঐ শ্রীলোকটির আরও সন্তান ছিল, কিন্তু সেবা মনে করিয়াছিল যে, হয়ত ধর্মভাব জাগিবার পূর্বে ঐ সব সন্তান হইয়া গিয়াছে। একবার যখন ধর্মভাব জাগিয়াছে তখন সে আর ঐ পথে যাইবে না। কিন্তু তাহারই আবার সন্তান সম্ভাবনা দেখিয়া সেবা মনে করিল, সে যাহা মনে করিয়াছে তাহা ত নয়, এবং যেইমাত্র এই ধারণা আর অমনি তাহার সংসর্গ ত্যাগ—ত্যাগও কি ত্যাগ! একেবারে দেখাশুনা এবং কথা বলা বন্ধ। ঐ শ্রীলোকটি একবার সেবার সহিত দেখা করিতে আসিলে সেবা তাহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিল যে, সে যেন আর তাহার কাছে না আসে। সরল বিশ্বাস হইতে কাহাকেও ঝাঁকুড়াইয়া ধরা সেবার পক্ষে যেমন অতি সহজ, আবার ঐ বিশ্বাসে আঘাত পাইলে তাহার ত্যাগও সেইরূপ পূর্ণভাবে হয়। এই সব কারণে সেবার শত্রুও কম নয়। আমি যখন তাহাকে সাবধান হইতে বলিয়াছিলাম তখন হইতে সে

যদি তাহা হইত তবে বন্ধুত্বের এই পরিণতি হইত না। কিন্তু তাহার সরলতার জন্তই সে আমার কথামত কাজ করিতে পারিল না।

ডাক্তারী সে পাশ করিয়াছে, কাজেই সে কিছুই জানে না বা বোঝে না এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তাহার বাবহারিক জ্ঞান বিশেষ নাই। আমার এই সব কথা শুনিয়া গোপীবাবা প্রশ্ন করিয়াছিল যে, এই জাগতিক জ্ঞান ত পরেও ফুটিয়া উঠিতে পারে। আমি বলিয়াছিলাম, “হাঁ, তাহা পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে চলিতে চলিতে যদি একবার জ্ঞানলাভ হইয়া যায়, তবে আর পতনের কোন সম্ভাবনা নাই। এইজন্তই ত অভ্যাস ইত্যাদির উপর এত জোর দেওয়া হয়।”

ছেলেবেলায় সেবার যে ধর্মভাব খুব ছিল তাহা নয়। ভগবান্ আছেন কি নাই, তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে কি হইবে না এ সব বিষয় সে কখনও চিন্তা করিত না। কিন্তু সত্যের প্রতি এবং নিষ্পাপ ভাবে জীবনযাপন করার প্রতি তাহার একটা তীব্র আকর্ষণ ছিল। এই সব কারণে সেবার আধারটা খুব শুদ্ধ। তাই অনেক জিনিষের প্রভাব তাহার শরীরের উপরে ক্রিয়া করিতে দেখা যায়। আমাকে স্পর্শ করিলেই যে তাহার এইরূপ দশা হয় তাহা নহে, অনেক সময় আমার ঘরে ঢুকিলেও তাহার এই দশা হয়। মাঝে মাঝে দেখিয়াছি যে আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে বলে যে তাহার শরীরের ভিতর দিয়া যেন ইলেক্ট্রিসিটি চলিয়া যাইতেছে এবং শরীর বিম্বিষ্ণু করিতেছে। এই বলিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। সর্বদাই যে এরূপ হয় তাহা নয়, তবে অনেক সময়ই এইরূপ হয়। এরূপও দেখিয়াছি যে, সে আমাকে স্নান করাইয়া দিয়াছে, গা মুছাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তাহার কোনই পরিবর্তন হয় নাই। তখন যদি আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, তাহার শরীরের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ হিষ্টিরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ এখনও ত সে আমাকে স্পর্শ করিতেছে, কিন্তু এখন ত তাহার কিছু হইতেছে না, তবে সে হাসিয়া বলিত, “না, এ সব হিষ্টিরিয়া নয়।”

ধ্যান করিতে যাইয়াও সেবা অনেক সময় দেখিয়াছে যে, তাহার এরূপ স্তব্ধভাব হয়। একবার তাহাদের কাজ দেখিবার জন্ত এক ইন্সপেক্টর আসিবার কথা ছিল। সেবাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। সেবা সাজিয়া-গুজিয়া বসিয়া

আছে ; কিন্তু ইন্সপেক্টর আসিতে একটু বিলম্ব আছে দেখিয়া সেবা মনে করিল যে এই অবসরে একটু ধ্যান করা যাক্ । যেই ধ্যান আরম্ভ করা আর অমনি এই অবস্থা ! কেবা গাড়ী ডাকে, আর কে-ই বা ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করে ; এই ব্যাপার লইয়া হলস্থল পড়িয়া গিয়াছিল এবং সেবার চাকুরী যাইবার উপক্রমও হইয়াছিল । তখন কর্তৃপক্ষেরা বলিয়াছিল, “এ যদি মাতাজীর কাছে যাইয়া ধর্মকর্ম করিতে চায় তবে চাকুরী ছাড়িয়া তাহাই করুক ।” এখনও সেবার ঐরূপ অবস্থা হয় । অনেক সময় রোগী বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে তখন শরীরের ঐ অবস্থা । যদি কথা বলার শক্তি থাকে তবে বলে, “আমাকে ধরিয়া গাড়ীতে বসাইয়া দেও, কারণ সে জানে যে কিছুক্ষণ পরেই তাহার এই অবস্থা কাটিয়া যাইবে । আবার অনেক সময় হয়ত কথাও বলিতে পারে না । রোগীবাড়ী গিয়াও সেবার এই অবস্থা হইয়াছে । আমি তাহাকে অনেক সময় চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছি ; কিন্তু সে বলে যে, তাহার চাকুরী করিতে ভাল লাগে ।

তাহার এই অবস্থাটা যে কি তাহা সে পূর্বে বুঝিতে পারিত না । পরে যখন সে দেখিল যে, ধ্যান করিতে গিয়াও তাহার এই অবস্থা হয় তখন তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে এ অবস্থাটা বুঝি ধ্যানেরই একটা অঙ্গ । এখন অবশ্য সে বুঝিয়াছে যে ধ্যান লাগিয়া যায় বলিয়াই তাহার এইরূপ অবস্থা হয় । খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের প্রকাশ এইভাবেই হইয়া থাকে । কেহ কিছু বলিয়া না দিলেও এই জাতীয় জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ হইতে থাকে, এবং নিজের অবস্থা বুঝিতে কষ্ট হয় না । আবার অনেক সময় জ্ঞানের প্রকাশ গুরুবাক্যের অপেক্ষা রাখে । গুরু যখন আসিয়া শিষ্যকে বলিয়া দেন যে, তাহার এই অবস্থা, তখনই তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয় । এই জন্য শাস্ত্র বলে যে গুরুর মহাবাক্য না পাইলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না ।

আমাকে স্পর্শ করিলে সেবার যে এইরূপ অবস্থা হয় তাহার কারণ এই যে, আমাকে দর্শন এবং স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ইন্দ্রিয়ের বহিমুখী বৃত্তিগুলি অন্তর্মুখী হয় । শরীর অবশ হওয়া, চোখ খুলিতে না পারা—এগুলি ধ্যানের অবস্থা । অপরেরও যে এরূপ হয় না এ কথা বলা যায় না, তবে তাহাদের দরজা

বন্ধ বলিয়া প্রকাশ নাই। সেবার আধারট। শুদ্ধ এবং নিৰ্ম্মল বলিয়া প্রকাশটাও এত সহজে হইয়া যাইতেছে।

(৩)

মিরাট গমন

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে মিরাট যাইবার সময় উপস্থিত হইল। পাণ্ডেজী একখানা বড় বাস লইয়া আসিয়াছেন যাহাতে ২৫ জন লোক বেশ বসিয়া যাইতে পারে। আমাদের বিছানাপত্র বাসে উঠান হইল। আমরা একে একে বাসে গিয়া বসিলাম। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়াছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে যাইবেন কিনা তাহা এখনও অনিশ্চিত। আফিস হইতে একদিনের ছুটি লইয়াছেন, তবে সাংসারিক অসুবিধার জন্ত তাঁহার স্ত্রী নাকি আপত্তি করিতেছেন। অখণ্ডানন্দজী, নিলিবাবু এবং আশ্রমের বালক ব্রহ্মচারী ব্যতীত আমরা সকলেই রওনা হইলাম।

বাস প্রথমে করমপুরের দিকে রওনা হইল। হেমবাবুর বাসা করমপুরে। তাঁহার বাসার নিকটে বাস আসিলে মা হেমবাবুর স্ত্রীকে খবর দিলেন। হেমবাবুর স্ত্রী আসিলে মা তাঁহাকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া তখনই আমাদের সঙ্গে আসিতে বলিলেন। তিনিও প্রায় সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে মেয়েদের পরীক্ষার বিষয় চিন্তা করিয়া আর যাইতে পারিলেন না; কিন্তু হেমবাবুকে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন।

এইবার বাস দেৱাছন স্টেশনের নিকট আসিয়া একটি রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। বাসে উঠিবার পর হইতেই শ্রীশ্রীমায়ের ভাবের পরিবর্তন দেখিতে লাগিলাম। কিষণপুরে যতদিন ছিলাম ততদিন মাকে একটু গন্তীর দেখিয়াছি। কথাবার্তা অবশ্য বলিয়াছেন, কিন্তু উহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গল্পগুজন করিয়া ভক্তদিগকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিবার শ্রীশ্রীমায়ের যে অসাধারণ ক্ষমতা আছে তাহার নিদর্শন কিষণপুর আশ্রমে পাই নাই। সদানন্দময়ী মায়ের আনন্দ যেন অন্তঃসলিলা ফল্লুর মত মনে হইয়াছে। বাহিরে উহার প্রকাশ দেখা যায় নাই। সন্দেহ হইয়াছে মা কি তবে বদলাইয়া গেলেন। মিরাট যাইবার

পথে দেখিলান শ্রীশ্রীমায়ের পূর্বভাব যেন কতকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার মুখ চোখে একটা সরস ভাব লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন মা হাসিয়া হাসিয়া কথাবার্তা বলিতেছেন। আমাদেরকে বলিলেন, “কাল ভাল দিন দেখিয়াই যাত্রা করিয়াছি।” গতকল্য মা যে তাঁহার শয়নকক্ষ পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলিলেন। গতকল্য মা যখন তাঁহার শয়নকক্ষ পরিবর্তন করেন তখন আমাদের কাহারও মনে এ কথা জাগে নাই যে, মা আশ্রম ত্যাগ করিবেন বলিয়াই ঐরূপ করিতেছেন; যদিও এইরূপ কক্ষ পরিবর্তন যে তাঁহার স্থান পরিবর্তনের পূর্বাভাস তাহা পূর্বেও দেখা গিয়াছে।

মা আবার বলিতেছেন, “এই দেহটা ঘুরিয়া ফিরিয়াই ভাল থাকে, তবে আজকাল কতকটা সময় এক জায়গায় থাকিতেছে। একবার শীতের সময় কিশোরপুর আশ্রমে খুব জ্বর হইল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে বুকে নিমুনিয়ার (নিউমোনিয়ার) দোষ হইয়াছে। নীচে যে ঘরে থাকিতাম ঐ ঘরটা খুব ঠাণ্ডা বলিয়া আমাদেরকে হল ঘরে আনা হইল। আমি নিমুনিয়া লইয়াই সিমলা রওনা হইলাম। পথে জ্বর, নিমুনিয়া সবই ছাড়িয়া গেল।”

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া মা হাসিতে হাসিতে লাগিলেন, “বাবাজী বেশ সরল। আজ মিরিট রওনা হওয়ার পূর্বে বাবাজী আশ্রমে আসিয়া অতি দুঃখের সহিত বলিল, ‘মা, আফিস হইতে ছুটি পাইলাম, কিন্তু বাসা হইতে পাইলাম না।’ বাবাজী কথাটা একটু ঘুরাইয়াও বলিতে পারিত—এরূপ বলিলেও চলিত যে বাসার অসুখ বিসুখ বা অসুবিধার জন্ত যাইতে পারিতেছি না; কিন্তু বাবাজী তাহা না বলিয়া একেবারে সোজাসুজি বলিল যে, মাতাজী (অর্থাৎ হেমবাবুর স্ত্রী) তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিতেছে না। (সকলের হাস্য)।

“স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমান সমান ভাব থাকিলে এইরূপই হয়। স্ত্রী চায় যে তাহার স্বামীও তাহার ভাবে ভাবিত হইয়া চলে। স্বামী যদি ভিন্ন ভাবের ভাবুক হয় তবে স্ত্রী সহ্য করিতে পারে না। স্ত্রী যদি স্বামীকে নিজের সমান না দেখিয়া গুরু বলিয়া মনে করে, তবে কিন্তু এরূপ হয় না। তখন স্বামীকে ভিন্ন ভাবে

ভাবিত দেখিলে তাহার কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু সে সেইজন্য স্বামীর আদেশ অমান্য করে না বা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে না।”

জিতেনবাবু। আজকাল স্বাধীনতা এবং সমান অধিকারের দিন কিনা তাই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট বড় ভাব নাই।

মা। হাঁ, আজকাল স্বামী যে স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকে এবং স্ত্রীও স্বামীর নাম ধরিয়া ডাকে তাহা আমার কাণে আসিয়াছে।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে আমরা শিবালী পাহাড়ের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম। শিবালী পাহাড়ের উপর দিয়া আমাদের বাস সর্পগতিতে চলিতে লাগিল। সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, আকাশে দুই একটি তারকা দেখা দিয়াছে। গোধূলির ধূসর আলোকে পাহাড়ের দৃশ্যগুলি অতি মনোরম দেখা যাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপটগুলি পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। কখনও আমরা উন্ধে উঠিতেছি, কখনও নীচে নামিতেছি, কখনও ঘনতরুঞ্জির ভিতর দিয়া চলিয়াছি, কখনও আবার বৃক্ষাদিশূন্য উপত্যকার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছি। পার্বত্য পথ হইলেও রাস্তাগুলি খুব সুন্দর, মুশোরীর রাস্তার মত বাঁধান। আমাদের বাসখানি অবলীলাক্রমে সচ্ছন্দগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া এই পথের উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে। শ্রীশ্রীমা নানা কথা বলিয়া আমাদের হাসাইতেছেন।

মা আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ত দেড় টাকার ইংরেজী কি?” আমাদের মধ্যে একজন উহা বলিয়া দিলে মা বলিতে লাগিলেন, “একবার আলমোড়া হইতে নৈনীতাল বাসে যাইতেছি, সঙ্গে কেবল মাত্র বিরাজমোহিনী। বাসওয়ালা আমাদের বাসের সম্মুখের আসনে আদর করিয়া বসাইল। পরে ভাড়া চাহিতে আসিয়া বলিল যে আমাদের কাছে one rupee eight annas দিতে হইবে। উহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আমি বিরাজমোহিনীকে দেড় টাকা দিতে বলিলাম। বাসওয়ালা নিশ্চয় মনে করিল যে, আমি বেশ ইংরেজী জানি। (সকলের হাস্য)।

“আর একবার বিরাজমোহিনীকে সঙ্গে লইয়া লক্ষ্মোর এক ধর্মশালায় গিয়া উপস্থিত হই। ধর্মশালার নিকটে এক ভদ্রলোকের বাসা। ভদ্রলোক আমার

রকম সকম দেখিয়া মনে করিল যে, আমি নিশ্চয়ই বি-এ পাশ করিয়াছি, আর তাহা যদি না করিয়াও থাকি অন্ততঃ বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। আমি যে লেখাপড়া জানি না তাহা সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিল না। শেষে যখন সমস্ত কথা শুনিল তখন তাহার বিশ্বাস হইল। আবার আমি যখন চলিয়া আসি তখন তাহাদের কি কারা।”

কথায় কথায় বিরাজমোহিনী দেবীর কথা উঠিল। মা বলিলেন, “সেবার বিরাজমোহিনীকে লইয়া যখন নানা জায়গায় বেড়াইতেছিলাম তখন আমাদের সম্বল ত কিছুই ছিল না। নানা স্থানে নানা লোকে টিকিট করিয়া দিয়াছে। একবার এক টিকিট কালেক্টর আমাদের টিকিট দেখিতে চাহিল। আমাদের টিকিট নাই জানিয়া সে-ই নিজ হইতে আমাদের টিকিট কিনিয়া দিল। টাকা কড়ি কিছুই ত সঙ্গে ছিল না, পথে যাহা জুটিতেছে তাহাই খাইতেছি। কখনও বা ধর্মশালায়, কখনও বা ষ্টেশনে রাত্রি কাটাইয়া দিতেছি। এ ভাবে চলাফেরা করা বিরাজমোহিনীর কাছে একেবারেই নূতন। সে মহাচিন্তায় পড়িয়া গেল। রাস্তায় আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা উদ্ধৃত হইত তাহাই সে সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল, তাহার নিজের জন্ত নয় সবই আমার জন্ত। আমাকে সময় মত কি খাইতে দিবে, কি পরিতে দিবে এই চিন্তায় সে অস্থির থাকিত। কোথা হইতে সে একটি বুড়িও যোগাড় করিয়া নিয়াছিল এবং উহার মধ্যে এটুকু এটুকু যাহা পাইত তাহাই রাখিয়া দিত’, শেষে কমলকে (ভট্টাচার্য্য) যখন আমাদের সঙ্গ হইতে বিদায় করিয়া দিলাম তখন তাহার সঙ্গে ঐ বুড়ি সহ সমস্ত জিনিষ পত্র দিয়া দিলাম। এদিকে বিরাজমোহিনীরও সঞ্চয়ের ভাব কমিয়া গেল; কারণ কিছুদিন সে আমার সঙ্গে ঘুরিয়া দেখিল যে, আমাদের কিছুই অভাব হইতেছে না, সময় মত সবই জুটিয়া যাইতেছে।”

মা আবার প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা বলিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, “ব্রহ্মচারীবাবা যদি আজ সঙ্গে থাকিত তবে খুব আনন্দ হইত। বাবাজীর বেশ মরল ভাব। বাবাজী আমাকে বলিত, “আমি আপনাকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঠেকাইতে পারি নাই।” আমার মুখে আমার অবস্থার কথা

শুনিয়া বলিত, “আপনি যে সব অবস্থার কথা বলেন তাহাতে ত এ দেহ থাকিবার কথা নয়।”

আমি। না, আমি ব্রহ্মচারী মহাশয়কে তোমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি নাকি সাধনের দুই একটা অবস্থা গত জন্মেই লাভ করিয়াছিলে, আর এ জন্মে বাকী অবস্থাগুলি খুব তাড়াতাড়ি লাভ করিয়াছ।

মা। (হাসিয়া) হাঁ, বাবাজী বলিত, ‘আপনি কপিকল দিয়া উঠিয়া গিয়াছেন’ (সকলের হাস্য)

এইভাবে হাস্যলাপ করিতে করিতে আমরা চলিয়াছি। সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। চারিদিকেই অন্ধকার। আমরা মাঠের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। মাঝে মাঝে খুব গরম হাওয়া গায়ে লাগিতেছে, এত গরম যে নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। আমাদের বাসও খুব দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, ঘণ্টায় ৩৫ হইতে ৪০ মাইল, কখনও কখনও ৫০ মাইল। এইরূপে আমরা রুরকী আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে গাড়ী থামাইয়া পেট্রল লওয়া হইল। পিপাসায় আমরা প্রায় সকলেই কাতর। পাণ্ডেজী লোক দ্বারা ঠাণ্ডা জল আনাওয়া আমাদের পান করাইলেন। রুরকীতে প্রায় ১০।১৫ মিনিট দেবী হইল। আমরা আবার রওনা হইলাম।

রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় আমরা মুজঃফর নগরে পৌঁছিলাম। ইহার পরই মিরাত। মিরাতের ভক্তেরা আমাদের আগমন সংবাদ পাইয়াছেন কিনা এই সব আলোচনা পরমানন্দ স্বামীজী ও নেপালদাদা করিতেছিলেন। রওনা হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে একখানা টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সেই টেলিগ্রাম যথাসময়ে না পৌঁছিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। স্বামীজীরা নানা ভাবে কথা বলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের নিকট জানিতে চাহিতেছিলেন যে আমাদের টেলিগ্রাম তাঁহারা পাইয়াছেন কিনা। মা ঐ সব কথা শুনিয়া শুধু হাসিতেছিলেন, আবার বলিতেছিলেন, “টেলিগ্রাম না পাইলেই বা ক্ষতি কি? আমরা নিজেদের বাড়ীতে যাইতেছি। কেহ না থাকিলেও আমরা ওখানে পৌঁছিয়া শুইয়া থাকিব।

সকালবেলা তাহারা আমাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইবে। একবার সিমলায়ও এইরূপ খবর না দিয়া গিয়াছিলাম। সিমলায় ইহার কীৰ্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়া আমাদিগকে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিল। আমরাও রওনা হইয়া গেলাম। সিমলার কালীবাড়ীতে কীৰ্ত্তনের আয়োজন হইয়াছিল। ভূপেন বসু কীৰ্ত্তন করিতেছিল। বহুলোকের সমাগম, ভাবিলাম এখন যদি প্রকাশ্য ভাবে কীৰ্ত্তন আসরে যাই তবে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে এবং কীৰ্ত্তন ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া বৌ সাজিয়া আমি কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়াই আসরের দিকে না গিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া গেলাম। দোতলার বারান্দা হইতেও আসর দেখা যায়। সেখানেও চেয়ার পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেখান হইতে মেয়েরা কীৰ্ত্তন শুনিতেছে। আমি যে আসরের নিকট দিয়া চলিয়া গেলাম কেহ কিন্তু আমাকে চিনিতে পারিল না। অনেকেই আমার মুখের দিকে তাকাইল, এবং তাহাদের মধ্যে পরিচিত লোকও ছিল, কিন্তু কেহই আমাকে চিনিতে পারিল না। দোতলার বারান্দায় গিয়া দেখি, যেখানে চৈতন্যদেবের একখানি ছবি টাঙ্গান আছে উহার নীচেই একখানা চেয়ার খালি আছে। আমি ঐ চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। চেয়ারখানা খালি থাকিবার কারণ এই যে, উহার সম্মুখে একটা থাম পড়িয়াছে। ঐখানে বসিয়া আসর দেখিতে হইলে একটু হেলিয়া দেখিতে হয়। আমি যে গিয়া চেয়ারে বসিলাম তাহা মেয়েরা দেখিয়াও দেখিল না। আমার পাশে যে বসিয়াছিল তাহার কাঁধে ভর করিয়া আমি বুকিয়া আসরের দিকে তাকাইতে লাগিলাম। যাহার কাঁধে ভর করিলাম সে ধাক্কা দিয়া আমার হাত সরাইয়া দিল। আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিল না।

“এদিকে নীচের তলায় বাবাজীদের মধ্যে একটা সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, কে এই স্ত্রীলোকটি যে এত তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেল? কোন গুণ্ডা ত স্ত্রীলোকের বেশে মেয়েদের মধ্যে চলিয়া গেল না? এই সব ভাবিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উপরে চলিয়া আসিল। এমন সময় আসরের মধ্য হইতেও কেহ কেহ উপর দিকে তাকাইয়া আমাকে চিনিতে পারিল। বুঝিতেই ত পার তখন কি যে অবস্থা!”

কথায় কথায় দিল্লী ও মিরাতের ভক্তদের বৈশিষ্ট্যের বিষয় মা আলোচনা করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, “দিল্লীর বাবাজীদের রকম এই যে, আমি যদি দিল্লীতে যাই তবে কি উপায়ে যে আমাকে বেশী দিন দিল্লীতে রাখিবে তাহা নিয়াই তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। কাকুতি মিনতি ত অনবরতই চলিতে থাকে, তাহা ছাড়া তাহারা আফিস বন্ধ করিয়া আমার কাছে পড়িয়া থাকিতে চায়। বলে, ‘বরং তোমার জন্ত মিথ্যা কথা বলিয়া আফিস বন্ধ করিব, তবুও তোমার নিকট হইতে নড়িব না।’ মিরাতের বাবাজীদের কিন্তু অজ্ঞ ভাব। যদি তাহাদিগকে বলি যে আজই যাইব, তাহারা তাহাতে কোনই আপত্তি করে না। আমাকে ছাড়িয়া দিতে কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহারা কিছু করিতে চায় না। এই দুই ভাবই সুন্দর।”

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে আমরা মিরাতে পৌঁছলাম। দূর হইতেই দেখিতে পাইলাম, মিরাতের ভক্তগণ আমাদের অপেক্ষায় রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জয়ধ্বনি দিয়া মাকে বাস হইতে নামান হইল। মেয়েদের একটি বিদ্যালয়ে আমাদের থাকিবার জায়গা এবং নাম-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে। আমাদেরকে ঐ বিদ্যালয়ের দোতলায় লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীপুরুষ বহুভক্ত মাকে ঘিরিয়া বসিলেন। একজন ভদ্রলোক অতি মধুর স্বরে একটি আবাহন সঙ্গীত গাহিলেন। রাত্রি ১২। কি ১২।টা পর্য্যন্ত গান ও কীর্তন চলিল। শেষে আমরা ত্বরিতোজন করিয়া দোতলায় উন্মুক্ত ছাদের উপর শুইয়া রহিলাম। ঐখানে একটি বিশিষ্ট শয্যায় শ্রীশ্রীমায়ের শয়নের বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

—ক্রমশঃ

আনন্দময়ী

শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় (লালগোলা রাজ)

মা আনন্দময়ী যখন ধরণীতে আবিস্কৃত হ'লেন,—

তখনো জাগেনি উষা, নিশীথিনী নেয়নি বিদায়—

তখনো সমীর বৃকে ধরণীর শান্ত বনছায়

ওঠেনি মল্লিত সুরে জাগরণ-গুহ্র সামগান,

বেদনার অশ্রু-তীর্থে আনন্দের আসেনি আহ্বান !

উন্মুখ পিপাসা ভরে বসুধার চিত্ত আত্মহার—

কে আনিবে অমরার আনন্দের স্নিগ্ধ বারিধারা ?

কে এলোরে ? কে এলোরে ? অকস্মাৎ জাগে কলরোল—

নীলিম আকাশে দোলে অমৃতের অনন্ত হিল্লোল ।

সে কোন্ করুণা যেন মুর্ত্তিমতী হয়েছে প্রকাশ—

সে কোন্ অরূপ আলো স্বরূপের আনে অধিবাস !

দিবা সেই আবির্তাব দীপ্তিময় অনন্ত আলোকে—

আনন্দময়ীর রূপে ব্রহ্মাণী যে এসেছে ভুলোকে !

সর্বপ্রকৃতিরূপা, সর্ববাস্তবিকা তিনি বিশ্বমাতা,

নিত্যসিদ্ধা, জ্ঞান তাঁর নিখিলের প্রজ্ঞান-বিধাতা ;

তিনি অগ্নি, তিনি হবিঃ, জল তিনি, তিনি যে বিশ্বাসুঃ

তঁাহারি বিভূতি বহে প্রাণবান্ স্তম্ভর বায়ু !

চরণ দু'খানি তাঁর পূজি' এই নয়ন ধারায়,

এই ভিক্ষা চাই, যেন কৃপা তাঁর কভু না হারায়

দিশাহারা জীবনের আশাহীন ঘন ঐধিয়ারে—

আনন্দময়ীর আলো, দেখা যেন দেয় বারে বারে ।

নামাবলী

সাত

নাম-ই গতি

হরেনাম হরেনাম হরেনামেব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরনুথা ॥ *

হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম-ই কেবল । কলিকালে এ ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় নাই-ই, নাই-ই, নাই-ই । এই হ'লো শ্লোকটির অর্থ । অনেক যুগ আগেকার শাস্ত্রে এই কথাগুলি লেখা । কিন্তু সংসারের জীব তার মর্মগ্রহণ করতে পারেনি । নিমাই এসেছিলেন জীবের কল্যাণের জন্ত । যে-কথা ছিল শুধু পুঁথির পাতায়, সেই কথাটি বসালেন তিনি মানুষের মনের মন্দিরে ।

প্রভুর একান্ত ভক্ত গুরুদ্বন্দ্বের ব্রহ্মচারী নবদ্বীপে থাকতেন ; তিনি ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র, ভিক্ষা ক'রে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেতেন । একদিন প্রভুর কীর্তনে ভিক্ষার বুলি কাঁধে নিয়ে গুরুদ্বন্দ্বের নৃত্য করছিলেন, এমন সময়ে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁর বুলি থেকে চাল গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে “হরেনাম”-শ্লোকের অর্থ বিবরণ করেছিলেন ।

“তবে গুরুদ্বন্দ্বের কৈল তগুল ভক্ষণ ।

হরেনাম শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥” †

গুরুদ্বন্দ্বকে মহাপ্রভু বলেছিলেন শ্রীমুখে—কলিকালে নাম-রূপেই শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ । নামের জোরে তাঁকে নামানো যায় । নাম ভগবানকে এমন আকর্ষণ

* বৃহন্নারদীয় বচন ৩৮।১২৬

† শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ১৮-২২ পয়ার দৃষ্টব্য ।

করে যে স্বীয় ধাম থেকে অবতরণ ক'রে তিনি ভক্তকে কৃতার্থ করেন। “হরেনাম” শ্লোকের ব্যাখ্যা ক'রে মহাপ্রভু গুণান্বয়কে এই কথা বলেছিলেন :—

“হরেনাম হরেনাম হরেনাম” এমন ক'রে তিনবার বলবার উদ্দেশ্য কি ? “দার্তা লাগি”—অর্থাৎ দূততার জন্য। “এব” শব্দটির মানে কি ? এটি একটি নিশ্চয়্যাত্মিক অব্যয়—বাঙ্গলাতে এর অর্থ বোঝানো হয় “ই”-শব্দ প্রয়োগ ক'রে। “হরেনাম”-মন্ত্রে “এব” শব্দটি বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে এবং “কেবলম্” শব্দ দিয়ে বিশেষ ক'রে বলা হয়েছে যে হরিনাম-ই একমাত্র গতি। পাছে কোনও রকম সংশয় থাকে সেই জন্য মহাপ্রভু আরও স্পষ্ট ক'রে বললেন :—

“কেবল শব্দ পুনরপি নিশ্চয় কারণ
জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম আদি নিবারণ।”

অর্থাৎ জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম ইত্যাদি কলিযুগে অনুপযোগী। যদি কেউ এ কথা না মানে যে হরিনাম-ই কলির একমাত্র সাধন, তার কি অবস্থা হবে ? এ প্রশ্নেরও উত্তর মহাপ্রভু দিয়েছেন :—

“অতথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার
“নাহি নাহি নাহি” এ তিন এবকার।”

“হরেনাম”-মন্ত্রের দ্বিতীয়-চরণে “নাস্ত্যেব”-শব্দটির শেষে “এব” অব্যয়টি রয়েছে এবং তার প্রয়োগ হয়েছে বার বার তিনবার ; সেইজন্যই মহাপ্রভু বলেছেন “নাহি নাহি নাহি এ তিন এবকার”।

আট

নাম-ই গতি

“হরি বল হরি বল হরি বল ভাইরে ।
হরিনাম বিনা জীবের অন্য গতি নাইরে ॥”

“হরেনাম”-মন্ত্রের সেই পুরাণো কথাটি এখানে সহজ বাঙলা কথায় বলা হয়েছে। হরিনামের মতন সহজ আর কিছুই নেই, হরিনামের মতন সফল আর

কিছুই নেই। মহাপ্রভু জীবকে বুঝিয়ে দিলেন, আচরণ দ্বারা দেখিয়ে দিলেন, যে একমাত্র নামের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। এই কলিকালে, যখন সহজে মানুষের মন ভাল-র দিকে যেতে চায় না, তখনো কেবল নামের প্রভাবেই ভগবানকে মানুষ আপনার করে পেতে পারে।

যা'র জীবন আছে—জন্মায়, বাড়ে এবং অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—সে জীব। পশুপক্ষী সব-ই জীব; গাছপালার-ও জীবন আছে, এক হিসাবে তারা-ও -জীব। কিন্তু এরা সম্ভ্রানে হরিনাম করতে পারে না। যে অবস্থাতে এরা জন্মায়, সেই অবস্থাতেই বড়ো হয় এবং সেই অবস্থাতেই মরে। নামের অধিকার নেই বলে এরা এক জন্মে অবস্থা বদলাবার মতন গতি লাভ করতে পারে না। মানুষের পরম -সৌভাগ্য—সে নাম করতে পারে। যে-মানুষ হরিনাম করে, সে শ্রীহরির ভালবাসা পায়, জীবনকে তাঁর মনের মতন ক'রে গড়ে তুলতে পারে। একজন্মেই তার অবস্থার রূপান্তর হওয়া সম্ভব—একমাত্র নামের আশ্রয়ে।

মা বলেছেন—পৃথিবীতে এ তো বস্তু নেই যা' আগুন দগ্ধ করতে না পারে; তেমনি মানুষে এতো পাপ করতে পারে না যা' নামের দ্বারা দগ্ধ না হয়। নাম, নাম শুধু নাম।

নয়

নারায়ণের কাছে নারায়ণের নিবেদন

“কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি নাম্।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ নাম্॥”

কৃষ্ণেরই অপর একটি নাম কেশব। রামের-ই অপর একটি নাম রাঘব। যিনি ভক্ত, তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে নানা নামে ডেকে আনন্দ পান—মাত্র একটি নামে তাঁর আশ মেটে না; ডাকার উচ্ছ্বাস পূর্ণতা লাভ করে না। তাই কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব।

এই স্তবটি শ্রীচৈতন্যদেবের নিজের মুখের সর্বাক্ষণের স্তব। বিশেষতঃ ২৪ বছর বয়স থেকে ৩০ বছর বয়স পর্য্যন্ত যে-ছয়টি বছর তিনি পদব্রজে দেশ-

দেশান্তরে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর পথের সাথী ছিল, সফল ছিল, এই নামের মালা ! সান্দ্রোপাঙ্গ নিয়ে কখনো যুদ্ধ কখনো বা উচ্চকণ্ঠে এই নাম গান করতে করতে মহাপ্রভু চলে যেতেন পথে পথে—কখনো তাঁর মুখে হাসির লহর, কখনো চোখে যমুনার ধারা, কখনো বা শ্রীঅঙ্গে পুলক-কম্প-শিহরণ। সেই দেব-দুর্লভ দৃষ্ট সে-যুগের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে পাগল ক'রে তুলেছিল।

“কৃষ্ণ কেশব”—মন্ত্র কীর্তন করতে করতে শ্রীগৌরহরি শ্রীকৃষ্ণ-নাম-প্রেমের বজ্রায় সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে ভাসিয়ে দিলেন। সেই সময় বাসুদেব নামক এক গলিত-কুষ্ঠ-রোগী ব্রাহ্মণ এসে মহাপ্রভুর পায়ে পড়েছিলেন। মহাপ্রভু আলিঙ্গন দিয়ে প্রেমস্পর্শে ব্রাহ্মণকে নিরাময় করেন। তখন বাসুদেব বুঝলেন এই দরাময় সাধারণ জীব নন, আমাকে দেখে মানুষে পালিয়ে যায়, আর স্বয়ং ঈশ্বর আমাকে স্পর্শ করলেন। রোগমুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ একদিকে যেমন আনন্দিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি আশঙ্কা তাঁর মনে জেগে উঠল—অধম হ'য়ে ছিলাম, সে এক রকম ছিল ভাল; এখন যে আমার মনে অহংকার উপস্থিত হবে। মহাপ্রভু বাসুদেবকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—কৃষ্ণ নামের আশ্রয় গ্রহণ করো, তাহ'লে অভিমান আসতে পারবে না :—

‘প্রভু কহে কভু তোমার না হবে অভিমান

নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ।’

“হে কৃষ্ণ, হে কেশব ! তুমি আমাকে শুদ্ধ করো, ত্রাণ করো, হে রাম, হে রাঘব ! তুমি আমাকে রক্ষা করো।”—এই হলো স্তবটির মোটামুটি অর্থ। কিন্তু এর ভিতরে আর-ও গভীর কথা রয়েছে। “ত্রাণ” চাই কিসের হাত থেকে ? সাপ-বাঘের হাত থেকে ? না ; রোগ-শোক-দারিদ্র্যের হাত থেকে ? না। কৃষ্ণ ছাড়া আর যা’-কিছু ইন্দ্রিয়ের বিষয় আছে সংসারে, সে-সব থেকে নিস্কৃতি ভিক্ষা করছেন, ত্রাণ পাবার আকুতি জানাচ্ছেন। কৃষ্ণ-ই জীবের একমাত্র শরণ, এই স্মৃতি চাই। কৃষ্ণ-ই জীবের চরম ও পরম আশ্রয়, এই বোধিতে প্রতিষ্ঠা চাই। “রক্ষ মাং” মানে কি ? রাখো আমাকে। কোথায় ? “তোমার মধ্যে।” স্তবটির মর্ম্ম কথা এই :—

“হে আমার প্রাণের ঠাকুর তুমি আমাকে পৃথিবীর সব-কিছু থেকে সরিয়ে

নিয়ে, হুঁহাত দিয়ে ঘিরে তোমার নিজের বৃকের মধ্যে স্থান দিয়ে আমাকে পরমগতি দান করো।”

নারায়ণের উদ্দেশ্যে এই ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছিলেন শ্রীগৌরঙ্গরূপী নারায়ণ। এই ছিল তাঁর জীবকে শিক্ষা দেবার ধারা। শুধু তাঁর কেন? শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে-ও তো দেখেছি—করজোড়ে, কাতর ভাবে, “হা ভগবান হা ভগবান” বলে কীৰ্ত্তন করতে। যেন তিনি না এলে মায়ের আর দিন কাটেনা। নিজের মুখে নিজের নাম নিজে নিয়ে, নিজের সন্তানকে নিজে-ই মা এমনি ভাবে শিক্ষা দেন। আবার মিনতি ক’রে মা গান ধরেন—

“মা আমারে দয়া ক’রে
শিশুর মতন ক’রে রেখো।”

কতো লীলাই আছে মায়ের।

দশ

অভিমন্যুর শরণাগতি

গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে ।
গোবিন্দ গোবিন্দ রথাজপাণে ॥
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ ।
গোবিন্দ গোবিন্দ নমো নমস্তে ॥

অৰ্জুনের পুত্র অভিমন্যু আর্ত, বিপন্ন, সন্ত্রস্ত। বিপদ যখন আসন্ন, তখন গোবিন্দের শরণ ছাড়া জীবের আর কী উপায় আছে? অভিমন্যু অভিজাত, স্বয়ং গোবিন্দ তাঁর মাতুল। কাতর হ’য়ে তিনি গোবিন্দকেই ডাকলেন। একবার নয়, দুইবার নয়, বারে বারে। হরি, মুকুন্দ, কৃষ্ণ, মুরারি যিনি, গোবিন্দ-ও তিনি-ই। স্তবটি গোবিন্দময়। একটিমাত্র তাঁর বিশেষণ রয়েছে—রথাজপাণি। সুদর্শনচক্র যার হাতে, সেই চক্রধারী সর্ব শক্তিমান নারায়ণের গলার ছন্দে-গাঁথা ভক্তির মালাটি পরিয়ে দিয়ে অভিমন্যু বারংবার তাঁর চরণে প্রণতি জানাচ্ছেন।

জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ এ-সব শত চেষ্টা করলেও আসবে কিনা বলা যায় না কিন্তু বিপদ যে মানুষের জীবনে বিনা চেষ্টাতেই এসে পড়ে তা সকলেই জানে। বিপৎকালে বিপদবারণকে স্মরণ করাও মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু সর্ব্ব দেহ মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে প্রণাম করা সহজ নয়। বিপদকে উপলক্ষ্য ক'রে জীবের মনে যদি নাম জাগে, প্রাণে যদি ঐকান্তিক প্রণাম রচিত হয়, তাহ'লে সে-বিপদই তো পরম সম্পদ। তাই বুঝি কুন্তী বিপদের মধ্যে থাকতে চেয়েছিলেন প্রাণে আর্তি জাগলেই সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বার্থিহারী বিপদবারণ এসে পড়বেন।

এগারো

রক্ষা করো

হরে গুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শোরে।

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণে নিরাজ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

এই স্তবটি ভক্তের গাঁথা নামের মালা। স্তবের অন্তে একটি ব্যাকুল প্রার্থনা—আমাকে রক্ষা করো, আমি যে নিরাজ্রয়। “আমি নিরাজ্রয়” এই অত্যন্ত সহজ সত্যটি মানুষের অনুভূতির মধ্যে যখন জাগ্রত হয়, তখনই সে তাঁর করুণা উপলব্ধি করতে থাকে। মায়ের মুখে শুনেছি সাধকের এমন একটি অবস্থা আসে যখন তার “নাম-করা” বন্ধ হয়। তখন আপনা হতেই মাম “হয়ে যায়”। “আমি নিরাজ্রয়” এই ভাবটি জাগলে, তিনি আশ্রয় দেন।

এই “নিরাজ্রয়” ভাবটি অর্জুনের মনে প্রথমে ছিল না। গীতার প্রথম অধ্যায়ে উনিশটি শ্লোকের সুদীর্ঘ বক্তৃতায় এবং ভগবানের কাছে তিরস্কৃত হওয়ার পরেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকে অর্জুন অনেক রকম যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তখন তিনি নিজেকে নিরাজ্রয় মনে করেন নি; তাঁর আশ্রয় ছিল নিজের বুদ্ধি, নিজের পরাক্রম নিজের সংকল্প। ভগবান তখন মৌন শ্রোতা; কখনো কখনো যেন তাঁর মুখখানিতে একটু উপহাসির ভাব—“প্রহসন্নিব”। অবশেষে অর্জুন ক্ষান্ত হলেন, তাঁর চোখ দুটি জলে-ভরা। অর্জুন তখন বুঝেছেন যে তাঁর স্বভাব কার্পণ্য দোষ দুই, তিনি

ধর্মসংমুঢ়েতা, কোন্টি ভাল কোন্টি মন্দ তা বোঝবার ক্ষমতা তাঁর নেই। এক কথায় তিনি নিরাশ্রয়। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে তবে-ই অর্জুন ভগবানকে বলতে পেরেছিলেন :—“শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্”। “আমি তোমার শরণাগত শিষ্য, আমাকে শিক্ষা দাও”। অর্জুনের এই প্রার্থনার ফলে শ্রীভগবানের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হল শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার অমৃত বাণী। নিরাশ্রয়-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত অর্জুনকে ভরসা দিয়ে ভগবান বললেন—নিরাশ্রয় হ'তে যাবে কেন? আমি তো রয়েছি—

“গতিভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।

প্রভবঃ প্রলয় স্থানং

নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥”

মায়ের ভাষায় বলতে গেলে, অর্জুন যেমন বাজিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি বেজেছিলেন।

বারো

নামের মালা

মাকে বাজাবার সহজ উপায়—নাম। অতএব মাকে নামের মালা পরানো যাক, “আনন্দবার্তা”-র মাধ্যমে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভগবানের বিভিন্ন নাম বিচিত্র রচনায় বিবিধ ছন্দে সংগীত হয়ে থাকে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ হল। “আনন্দবার্তা”-র পরবর্তী সংখ্যাতে পাঠকপাঠিকাদের সহযোগিতায় এই নাম—সংকলনের কলেবর বৃদ্ধি হবে আশাকরি। শুভ সংকলন করুন—আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের সমবেত উদ্যোগে মাকে একটি সর্বদ্বন্দ্ব-সুন্দর “নামাবলী” নিবেদন করতে হবে।

১। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

- ২। গোপাল জয় জয়, গোবিন্দ জয় জয়।
রাধারমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় ॥
- ৩। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে।
হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব ॥
- ৪। শ্রীরাম জয় রাম।
জয় জয় রাম ॥
- ৫। রঘুপতি রাঘব রাজারাম।
পতিত পাবন সীতারাম ॥
- ৬। গৌরী শঙ্কর সীতা রাম।
রাধে রাধে শ্রাম শ্রাম ॥
- ৭। কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল শ্রাম।
রাধা মাধব রাধিকা রাম ॥
- ৮। কৃষ্ণ গোবিন্দ শ্রীমধুসূদন।
রাম নারায়ণ হরে ॥
- ৯। অচ্যুত কেশব রাম নারায়ণ।
কৃষ্ণ দামোদর বাসুদেব হরিং ॥
শ্রীধর মাধব গোপিকা বল্লভ।
জানকী নায়ক রামচন্দ্র ভজে ॥
- ১০। জয় শিব শঙ্কর।
বোম বোম হর হর ॥
- ১১। দুর্গতি নাশিনী দুর্গে জয়।
ভবানী কি জয় শিবানী কি জয় ॥
উমা কি জয় জয়।
রমা কি জয় জয় ॥
- ১২। প্রেয় ভগবান প্রেয় ভগবান।
গেয় ভগবান ধ্যেয় ভগবান ॥

১৩। গুরু গোবিন্দ ব্রহ্মনাম ।

মা দুর্গা শিবরাম ॥

১৪। মা মা মা মা মা মা মা

মা মা মা মা মা মা মা

তেরো

আমাদের মা

মা-নামটিতে অফুরন্ত মধু। মা-নামের অর্থ জানবার জন্ত অভিধান বা শাস্ত্রের পাতা ওলটাতে হয় না, পণ্ডিতের শরণাপন্ন হতে হয় না। মা আছেন। মা সন্তানকে ভালবাসেন। সন্তান মাকে চাইলে-ই পায়। এ ক্ষেত্রে চাওয়া মানো-ই পাওয়া।

কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী, শিব এঁদের কা'কে-ও কখনো দেখিনি। আমাদের মাকে চোখে দেখেছি; মায়ের স্পর্শ পেয়েছি; মাকে ডেকে মায়ের সাড়া পেয়েছি। মা নিজেই বলেছেন “আমি তো সর্বদা তোদের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। তোরা দেখতে চাসনা আমি কি করবো? জেনে রাখ তোরা কখন কি করিস না করিস—নিকটেই হোক, দূরেই হোক—যে কোনও সময়ে এ-শরীরের একটি লক্ষ্য তোদের উপরে সর্বদা জেগে রয়েছে।”

এই কথাটি মায়ের শ্রীমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল বহুদিন পূর্বে। এই মাতৃবাণীর অন্তর্নিহিত সত্যকে অনেক মাতৃসন্তান অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেছেন। কিন্তু জীব-স্বভাবের বশবর্তী হয়ে আমরা প্রমাণ পেয়ে-ও আবার প্রমাণ চাই। অবিশ্বাসী মনে প্রমাণ চাইলে প্রমাণ পাওয়া যেতে-ও পারে, না যেতে-ও পারে এবং প্রমাণ পেলেও মাকে পাওয়া কঠিন। কিন্তু সরল বিশ্বাস নিয়ে শুধু মাকে চাইলে, মাকে পাওয়া যাবে-ই। নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মায়—প্রমাণে নয়, প্রসাদে; অর্থাৎ মা প্রসন্ন হলে। মায়ের প্রসাদ বিতরণ চলেছে-ই অনুক্ষণ। নিতে জানলেই সে প্রসাদ পাওয়া যায়। সন্তানকে প্রসাদ না দিয়ে মায়ের-ও তো কোনও উপায় নেই। মা একাধারে আমাদের গুরু এবং মা। “জয় গুরু জয় মা, যেই গুরু সেই মা।”

গত গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে হিমাচল প্রদেশে এই মাতৃ-গুরুকে পূজার আয়োজন হয়েছিল। রাজা থেকে আরম্ভ ক'রে দীনতম প্রজাতি পর্য্যন্ত সমান অধিকারে সে-পূজার অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই উপলক্ষে মা বলেছিলেন :—“এই ছোট্ট মেয়েটার প্রার্থনা, আজ-ই—তোমরা আজ থেকেই হরিভজনে লেগে যাও, স্বরূপ প্রকাশের দিকে যাত্রা আরম্ভ করো। এ ছাড়া জগতে আর শাস্তি কিছু নেই। পরম পদের যাত্রী হবার চেষ্টা করো, যেখানে আপদ, বিপদ, বিপথ নেই।” মা বলেছেন হরিনাম করতে। আমরা বলি :—

মার নামে হরি নাম

হয়ে আছে লীন।

“মা, মা” বলি নামাবলী

গাও নিশিদিন।

মা মা মা মা মা মা মা

মা মা মা মা মা মা মা ॥

চৌদ্দ

প্রণাম

- ১। হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্ততে ॥
- ২। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
- ৩। শরণাগত দীনার্ভ পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্তুার্থি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥
- ৪। সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্ততে ॥
- ৫। ভবভাপপ্রণাশিত্রে আনন্দঘন মূর্তয়ে।
জ্ঞানভক্তি প্রদায়িত্রে মাতস্তভ্যং নমো নমঃ ॥

প্রণাম মন্ত্রে নামের মালা গুণের মালা হয়ে উঠেছে। প্রণাম মন্ত্রে কৃষ্ণকে

দেখছি দয়ার সাগর। যারা দীন-দরিদ্র, যাদের কেউ নেই, কৃষ্ণই তাদের আপনজন। জগতে যত জীব আছে, তাদের সকলের পালনকর্তা তিনি। গোপ গোপিকা—যাদের মতন ভক্ত ত্রিভুবনে নেই, তাদের প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণ। তিনি রাধিকার প্রভু। তাঁকেই প্রণাম করি।

দ্বিতীয় মন্ত্রেও কৃষ্ণকে, গোবিন্দকে প্রণাম করি। কেমন তিনি? ব্রহ্মণ্যদেব অর্থাৎ সত্যদর্শী মুনিগণের পূজনীয় তিনি; গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী তিনি, অর্থাৎ সমস্ত প্রাণী-জগৎ এবং সমস্ত জ্ঞানী-জগতের কল্যাণকারী। সমস্ত বিশ্বের মঙ্গলময় বিধাতা তিনি। এই দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে কৃষ্ণ আছেন, গোবিন্দ আছেন। কিন্তু তাঁর প্রসন্ন কল্যাণময় রূপটি যেন নামকেও ছাপিয়ে অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। সেই রূপটিই তো আমার মায়ের রূপ।

তাই প্রণামের তৃতীয় মন্ত্রে বলেছি :— মাগো! শরণাগত, দীন, আর্তজনকে তুমিই তো পরিত্রাণ করো, তাদের সমস্ত হুঃখ তুমিই হরণ করো মা নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

চতুর্থ মন্ত্রে দেখেছি, মা যে কেবল মঙ্গলময়ী তা নয়, জগতে যতো কিছু মঙ্গল আছে, তাদেরও মঙ্গলবিধান করেন আমার মা—তিনি সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যা, তিনি সর্ব অভ্যুত্থানসাধিকা, সকলের আশ্রয়ভূতা ত্রিভুবনজননী। তাই বলছি :— ওগো মা, গৌরী নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

মাগো! তুমি যে কেবল ভবতাপ দূর করো তা' নয়, তুমি জ্ঞান-ভক্তি প্রদায়িনী। তুমি জ্ঞান ভক্তি না দিলে আমরা পাবো কোথা থেকে? মা! তুমি আনন্দঘন মূর্তি, তোমাকে প্রণাম করি, বারে বারে প্রণাম করি।

মাগো! গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে তোমার এই বাণীর মর্ম বোঝবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের কাছে শাস্তিও তুমি, পরমপদও তুমি, পরম পথও তুমি, স্বরূপও তুমি, প্রকাশও তুমি, বিভূও তুমি, অণুও তুমি। তোমাকে প্রণাম জানিয়ে তোমারই নামাবলী তোমাকেই সমর্পণ ক'রে, তোমার সন্তান তোমার প্রসাদ চায়।

“জয় মা আনন্দময়ী”

আনন্দম্

নন্দিনী-মা

(৫)

শুনেছিলাম তুমি যখন

একটু-খানি-মেয়ে

দেব-দেউলে ফ্যালফেলিয়ে

রইতে শুধু চেয়ে ।

নয়ন-জলে জননী তোর

করতো নিবেদন

মন্দিরেতে আপন-মনে

মনের আবেদন ।

অবাক্ হয়ে বলতে তুমি

আঁচল ধ'রে মা'র

ঠাকুর-ঘরে এমন ক'রে

খুঁজছো দিশা কা'র ?

দিদিমা কয় আদর ক'রে

“মাণিক সোনা মেয়ে

ঠাকুর-ঘরে কী পাওয়া যায়

ছাথনা কেন চেয়ে !

প্রণাম ক'রে পরাণ ভ'রে

যুক্ত-করে বল—

ঠাকুর, তুমি করুণাময়

কর গো মঙ্গল ।”

মায়ের কথায় নন্দিনী-মা
 মন্দিরেতে যায়
 আনন্দেতে মগ্ন প্রাণে
 মূর্তি পানে চায় ।

শিশুর মুখে ফুটলো বাণী
 চাইতে গিয়ে দান ।
 “তোমার বা’তে আনন্দ হয়
 তাই করো বিধান ।”

“প্রেয় পথ হইল আপাত মনোরম । আর শ্রেয়
 হইল আপাত দুঃখজনক, কিন্তু পরিণামে মঙ্গল-
 দায়ক ও শাস্তি । সেই শ্রেয়কে প্রেয় করিতে হয় ।”

“আ”

ডায়েরীর কয়েক পৃষ্ঠা

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সন—

সোলন হইতে কয়েক দিন হয় মা রাজাসাহেব* প্রার্থনায় সিমলাতে আসিয়াছেন। জ্যাকো পাহাড়ের উপরে রাজাসাহেব নূতন একটি বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। মাকে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিবেন এই আশায় এতদিন আর তিনি এই বাড়ীতে থাকেন নাই।

সকালবেলা মা তখনও নিজের ভাবে শুইয়া আছেন। আমি কি কাজ করিতেছিলাম। বিমলা আসিয়া আমাকে খবর দিল যে মা খুব সুন্দর গান গাহিতেছেন। ছুটিয়া গিয়া দেখি মা মগ্ন হইয়া গাহিয়া যাইতেছেন—

“আও মেরে সলোনা ছলিয়া রে বনোয়ারী রে।

আও মেরে সলোনা ছলিয়ারে ॥”

শুধু এই পদ কয়টিই ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমন করুণ সুরে গাহিতেছেন যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। চক্ষু বোজা অবস্থায়। কি অপূর্ব সুর! চতুর্দিকের আবহাওয়া সেই সুরের স্পন্দনে মুখরিত। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলিয়া আমাকে দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন— “কেউ গাইছে, শুনলাম। গোয়ালিনীদের গান আর কি।” এইটুকু বলিয়াই আবার গাহিতে লাগিলেন। একটু পরে বলিলেন—“সুরটা তোরা রেখে দে। বিভূকে ডাক।” বিভূ আসিয়া দ্বার সঙ্গে সঙ্গে অনেকবার ঐ পদগুলি গাহিল। কিন্তু সুরটি ঠিক যেন ধরিতে পারিতেছে না। মা বলিলেন—“এ সব সূক্ষ্মের সুর।

* সোলনের রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত দুর্গা সিংজী, মায়ের একান্ত অমুগ্ধ ভক্ত। মা নাম দিয়াছেন “যোগীরাজ”। সকলে “যোগীভাই” বলিয়া ডাকেন।

এই জগতের হাওয়ায় এসে বিলীন হয়ে যায়। রাখা মুন্সিল হয়।” আমরা নিরাশ হইলাম।

সকাল বেলা সৎসঙ্গে অবধূতজী মহারাজ ঐ গানের বিষয়ই মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মা গম্ভীর ভাবে বলিলেন—“স্বাভাবিক ভাবে না আসিলে কি ঐ সব জিনিষ আসে?” অবধূতজী পদগুলি শুনিয়া বলিলেন—“ইহা অতি চমৎকার ব্রজভাষা। বনওয়ারী মানে বনবিহারী, সলোনা শব্দের অর্থ রমণীয়, মনোহর, ছলিয়ারে—ইহাও প্রেমেরই ভাষা।”

আমি ত প্রথমে পদগুলিই ঠিক বুঝিতে পারি নাই। এতক্ষণে অর্থ কিছুটা বুঝিতে পারিলাম। ইহা শ্রীরাধার প্রিয়তমকে একান্ত ভাবে আহ্বানের গান। এই জগতের গান ইহা না। তাই বিভূ শত চেষ্টা করিয়াও সুরটি ঠিক ঠিক যেন ধরিয়া রাখিতে পারিল না। তবে মা বলিলেন—“শুধু এই সুরটুকুর দিকেও যদি কারো বিশেষ খেয়াল থাকে তবুও তাতে বিশেষ শুভফল অবশ্যই দেবে।”*

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার—

রাজা সাহেবের বিশেষ আগ্রহে মা আজ আবার সোলনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলা একটি বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিল। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী মায়ের সঙ্গে সাধনভজন বিষয়ে কিছু কথা বলিতেছিল। তাহার কথা হইয়া গেলেই মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—“ছাখ্, দিদি, কি রকম ঘটনা! ওত দেবী গিরিজীর শিষ্য। কিন্তু কি ধ্যান করবে এই জাতীয় কথা এই শরীরকে জিজ্ঞাসা করছিল। এই শরীরের ত প্রথমে খেয়াল হচ্ছিল যে দীক্ষা অনুযায়ীই ধ্যানের কথা ইত্যাদি বলা হবে। ও কি জপ করে তাও পরিষ্কার বলছিল। এর মধ্যে হঠাৎ দেখি কি চৌকির এই কোণায় (মা যেদিকে মাথা দিয়া শয়ন করেন) এক মূর্তি হাত উঠিয়ে ঐদিকে (মার একটি বড় ছবি রাখা ছিল) দেখিয়ে দিচ্ছে। একবার দিল। আমি কথা বলতে বলতে ঐদিকে চেয়ে দেখলাম। আবারও ঠিক ঐ রকমটাই দেখিয়ে দিল।”

* আশ্চর্যের কথা এই যে ইহার পরে আজ অবধি যতবারই বিভূ এই গানটি গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে ততবারই তাহার কি রকম ভাব হইয়া পড়ে। অনেকেই তাহা জানেন।

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“কি জানি, তোর ঘরের দরজার দিকেই দেখাল নাকি।” আমিও হাসিয়া বলিলাম—“বেশত। আমাকেই দেখিয়ে দিল বুঝিলাম। কিন্তু কি রকম মূর্তি?”

মা তখন হাসিয়াই জবাব দিলেন—“পার্থ সারথির যেমন রূপ না? সেই রকমই পোষাক পড়া। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ্ঞানুলম্বিত বাহু বলে না? সেই রকম লম্বা লম্বা হাত উঠিয়ে ঐদিকে দেখাচ্ছে। ছাখ্, প্রথমে আমার খেয়াল হয়নি। পরে খেয়াল হল যেখানে ঐ মূর্তির প্রকাশ সেখানেই ত শ্রীমদ্ভাগবত রাখা আছে।”

এই অন্তত ব্যাপারটি তখনই সেই ব্রহ্মচারীটিকে মার নিকট ডাকিয়া সব বলিলাম। সেও শুনিয়া বলিয়া উঠিল—“হ্যা, কথা বলার সময় মার ভাবটি কেমন যেন অশ্রমস্ক ছিল। ঘরের আবহাওয়াটিও যেন কেমন একটু। কথা বলতে বলতে মা হবার ঐদিকে তাকালেন। কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পাইনি।”

মা চুপ করিয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন আর মৃহ্ মৃহ্ হাসিতেছেন। আমি আবার তাহাকে বলিলাম যে মাত সব সময় সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলেন না। তবে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং আজ আবিভূত হইয়া মায়ের ঐ মূর্তিকে ধ্যান করিতে বলিয়া গেলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অগত্যা মা নিজ হইতেই তাহাকে বলিলেন—“আচ্ছা, একটা কাজ অন্ততঃ করো। যখনই ধ্যান করতে বসবে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের ঐ মূর্তির ধ্যান করে প্রণাম করে তবে অন্য ধ্যান করবে। তিনিই ত আজ এইরূপে এসে দেখিয়ে দিলেন। তাই তাঁকে প্রথমে স্মরণ করা।”

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার—

কথায় কথায় মা একটি বহু পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিলেন। ভাইজী ও মা তখন দেরাহনের দিকে আছেন। একবার পায়ে হাটিয়া উত্তর কাশী যাইতেছেন। পার্বত্য পথে চলিতে চলিতে একস্থানে ভাইজী ক্ষুধা-তৃষ্ণায় খুবই কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। ভাল মত পথও চলিতে পারিতেছেন না। চারদিকে পাহাড় ও শুধু গভীর জঙ্গল। লোকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। হঠাৎ মার খেয়াল হওয়া মাত্র দেখা গেল একটি ছোট্ট ছেলে জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাঁহাদের দিকেই আসিতেছে।

তাহার হাতে বড় একটি খোয়ার ডেলা। সবই আশ্চর্য্য! তাহার নিকট হইতে উহা খাইয়া এবং বরণার জল খাইয়া ভাইজী একটু সুস্থ হইলেন। পরে ভাইজী মাকে বলিয়াছেন যে ঐ রকম অপূৰ্ণ স্বাদযুক্ত খোয়া তিনি পূৰ্বে কখনও খান নাই।

আরও একদিনের ঘটনা। পথে চলিতে চলিতে ভাইজীর খুব তৃষ্ণা লাগিয়াছে। মারও জল পাইলে ভাল হয় এই রকম ভাবটা। হঠাৎ মার ঐ ভাবটাও চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাইজীও অনুভব করিলেন তাঁহার তৃষ্ণাও মিটিয়া গিয়াছে। মা ভাইজীকে প্রকাশ করিয়া বলিলেন—“অটল তরমুজ ভোগ দিচ্ছে। তাই আর তৃষ্ণা নাই।” বলা বাহুল্য অটলদা তখন সে স্থান হইতে শত শত মাইল দূরে সেই বাংলা দেশে। ভাইজী মনে করিয়া তারিখ ও সময় লিখিয়া রাখিলেন। পরে অটলদাকে চিঠি লিখিয়া উত্তর পাইলেন যে গরমের সময় বলিয়া ঠিক ঐদিন ঐ সময়েই তিনি মায়ের ছবির নিকট তরমুজের সবৎ ভোগ দিয়াছিলেন। মায়ের লীলার কি অন্ত আছে? এইরূপ কত শত ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটয়া যাইতেছে। কতটুকু তাহার আমরা জানিতে পারি বা আমরা জানিবার অধিকারী?

আর একটি চমৎকার ঘটনার কথা মনে পড়িল। সেদিন জয়ানন্দ মার সঙ্গে একান্তে কি কথা বলিতেছে। নবাগত অ্যামেরিকান যুবক জ্যাক আঙ্গার। মা নাম দিয়াছেন ‘জয়ানন্দ’। কথা বলিতে বলিতে কি কথার উপরে মা বলিতেছেন—“এই শরীরটা কাহাকেও ডাকিয়া আনে নাই। আবার কাহাকেও তাড়াইয়াও দেয় না।” মা অনেক সময়ই আমাদের নিকট এই জাতীয় কথা বলেন। কিন্তু জয়ানন্দ মার এই কথাত্তে মোটেই তৃপ্ত না হইয়া বলিয়া উঠিল—“তবে কি আমাদের সঙ্গে মার সে রকম কোনও সম্বন্ধই নাই। তাই যদি হয় তবে আমি ঐরূপ দেখিলাম কেন?”

মা অল্প অল্প হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন কি দেখিয়াছে। সে বলিতে লাগিল যে অ্যামেরিকা হইতে ভারতে আসিবার পথে একদিন জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। মনটা বড়ই উদাস। কোথায় যাইতেছে? কাহার কাছে যাইতেছে? যে উদ্দেশ্যে স্বদেশ হইতে পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনকে

ছাড়িয়া অজানা দেশের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে সেখানে সত্যই কি তাহার অভীষ্ট লাভ হইবে? ইঠাৎ দেখিল শূন্যের মধ্যে সমুদ্রের উপরে উজ্জ্বল এক জ্বীমূর্তি। ধীরে ধীরে সেই মূর্তি স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। বলা বাহুল্য মায়ের কোনও ছবিও সে পূর্বে দেখে নাই। ভারতে পৌঁছিয়া কালী আশ্রমে আসিয়া মার প্রথম দর্শনেই বিস্মিত হইয়া দেখিল এই সেই জ্বীমূর্তি। সেই হইতেই সে মায়ের আশ্রমে। আজ মায়ের মুখে ঐ জাতীয় কথা শুনিয়া স্বভাবতঃই তাহার মনে হইল মাই যদি না ডাকিয়া আনিয়া থাকেন তবে ঐ ভাবে তাকে সেই সুদূর অ্যামেরিকা হইতে কে এখানে লইয়া আসিয়াছে? ইহার প্রকৃত উত্তর ত একমাত্র মাই দিতে সক্ষম।

*

*

*

*

২১শে শ্রাবণ, বুধবার—

কালী আশ্রমে গঙ্গাবক্ষে হল ঘরে প্রথম সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত আশ্রমটিতেই যেন একটা খুব শান্ত গম্ভীর ভাব খেলা করিতেছে। বিকালে ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সকলে মায়ের উপস্থিতিতে ধ্যানে বসিয়াছে। মা চুপচাপ কাপড় ঢাকা দিয়া শুইয়াছিলেন, ধ্যানের সময় সমাপ্ত হইলে মা উঠিয়া বসিলেন। কেমন যেন একটু ভাবাবেশের মত মনে হইল। আস্তে আস্তে বলিলেন—“মৌনের সময় দেখছি কি একটি ৪।৫ বছরের সুন্দর ছোট্ট ছেলে সাদা কাপড় পড়া, খালি গা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, এই শরীরের কাছে বসে। এই শরীরের দিকে মুখ করে মগ্ন হয়ে গাইছে—‘হে পিতঃ, হে হিত, হে ব্রহ্মভূতম্।’ তারপরে ‘ব্রহ্মভূতম্’ শব্দটাও ছিল। কিন্তু খুবই অস্পষ্ট।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মা নীরব রহিলেন। আর কিছুই বলিলেন না। উপস্থিত সকলেই বুঝিলেন যে মাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ শব্দগুলি গাওয়া।*

২৩শে শ্রাবণ, শুক্রবার—

সংযম সপ্তাহের আজ তৃতীয় দিবস। সংসঙ্গ খুবই সুন্দর মত চলিতেছে।

* সেই বৎসর হইতে প্রতি সংযম সপ্তাহেই ঐ গানটি বিকালে মৌন সমাপ্ত হইলে গাওয়া হইয়া থাকে। অন্ত কখনও গাওয়া মা নিষেধ করিয়াছেন।

আজও বিকালে মৌনের সময়ে মা স্নান করি কি সব দেখিয়াছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা আস্তে আস্তে বলিলেন—“দেখছিলাম কি জানিস্ ? তোরা যে ব্যাগ রাখিস্ না, সেই রকম একটা ব্যাগের ভিতর নানা রকমের ছেঁড়া সব কাপড় কত রং বেরংয়ের। সেইগুলি দেখে খেয়াল আসল যে সংযম ব্রতে অনেকেরই পর্দা কেটে গেল আর কি। আর একটা শব্দও শোনা গেল—‘আপনাতে আপনি।’”

মার মুখে এই সব কথা শুনিয়া সকলেরই মন উৎসাহে ভরিয়া গেল। এইভাবে অহৈতুকী কৃপা করিয়া মা যে আমাদের কত জন্মজন্মান্তরের পর্দা বা আবরণ দূর করিয়া দিতেছেন তাহার কতটুকুই বা আমরা বুঝি।

“সর্ব্বহারা মানে সব পাওয়া। তিনি যখন সর্ব্বহারা রূপে প্রকাশিত হতে পারেন, আশা করবে সর্ব্ব পাওয়া রূপেতেও প্রকাশিত হবেন-ই।”

“মা”

মা হারিয়ে মা পেয়েছি

গোপাল

কুচবিহার কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। একদিন সন্ধ্যায় খেলার পর মাঠে বসে কয়েকজন সহপাঠী মিলে রাজা, উজির মারছিলাম। হঠাৎ একজন বলে উঠল “ভাই শোন, কাল থেকে ত তিনদিনের ছুটি ; কি করা যায় বল ত ?”

ভাই ত, সকলেই চুপ। তখন আমাদের খেলা ছিল মুখ্য আর পড়া ছিল গোপ।

এমন সময়ে একজন বললে, “গুনেছি যে এখান থেকে কিছু দূরে, ভারতের এলাকা পেরিয়ে, হিমালয়গিরিপ্রারম্ভে, খুব জাগ্রত স্বয়ম্ভু শিব আছেন ; মহাকাল নামে প্রসিদ্ধ। এখান থেকে বক্সার ট্রেনে যেতে হয়। তারপর ভারত সীমানা পেরিয়ে ঘণ্টা তিন চারেকের রাস্তা। তারপরেই মহাকাল পর্বত। আবার রাত্রিতেই বক্সার দিয়ে এসে ট্রেন ধরা যাবে। তবে রাস্তা নাকি খুবই দুর্গম। যথেষ্ট নাকি প্রাণের ভয়ও আছে।

“চল না কালকেই যাই। বাড়ীতে কাউকেও জানান নাই, তবে যেতে দেবে না।”

আমি বললাম, “তুই তো লোভ দেখালি। আমি এক পায়ে খাড়া। কিন্তু বাধা দুটো। বক্সার অবধি বাওয়ার ট্যাকে পয়সা কই! তোদের হয়তো বা আছে, আমার নেই। আর দুই নম্বর রাস্তা দেখাবে কে? স্টেশন মাঠারের ছেলে পাশেই বসেছিল—“চিন্তা করিস্ না। ও দুটোরই ভার আমার। ট্রেনে আসা যাওয়ার পাস আমি যোগাড় করে দেব। আর স্টেশনে একটা পাহাড়ী দারোয়ান আছে সে মহাকালের রাস্তা নাকি চেনে। আমাদের কাছে তো ভাই গল্প করেছে।”

অমনি সাত জনের একমত—জয় মহাকাল বাবার জয়।

পরদিন কাহাকেও না বলে ভোরেই রওয়ানা হওয়া গেল। প্রকাশ পিকনিক করতে যাচ্ছি।

সাথে কোন বালাই ছিলো না। খালি পা, পটকা মারা ধুতি, আর এক সার্ট। খাওয়া—পাহাড়ী ভরসা দিল পাওয়া যাবে।

পৌঁছলাম বক্সার। এইটা এদিককার উত্তর ভারতবর্ষের শেষ স্টেশন। একটু দূরেই পাহাড়ের মাথায় বক্সার চুর্গ, ভারতবর্ষের উত্তর পূর্ব সীমানার প্রহরী স্বরূপ।

গাইড পাহাড়ী জানাল—ওখানে বহু সৈন্যসামন্ত থাকে।

যাক্ গে, রওয়ানা হলাম। আগে আগে পাহাড়ী, পেছনে আমরা সাত কুতুহলী যাত্রী। তীর্থযাত্রী নয়। ধর্মের কোন ভাবনা, আমাদের মনের কোন কোণেও ছিল না।

কিছুটা সমতল ভূমি পেরিয়েই দেখতে পেলাম, একটি খরশ্রোতা, স্বল্প-পরিসরা নদী, কাকচক্ষু তুল্য তাহার জল, বড় বড় পাথরের আনাচ কানাচ দিয়ে কুলু কুলু স্বরে বয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ী বোঝাল এই নদী মহাকালের মাথা থেকে নাকি বেরিয়েছে। এই নদীর পাড়ে পাড়ে নাকি যেতে হবে।

চলছি তো চলছিই। ওদিকে পেটে ধীরে ধীরে ক্ষুধার আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে। কেউ আর কিছুই বলছে না। সকলেরই মুখের ভাবটা “দেখ না আমি কত বাহাদুর।”

পাহাড়ীই রক্ষা করল। “তোমরা এইখানেই বস। আমি ঐ যে দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি। গ্রাম আবার কোথায়? ঐ যে দূরে ৮১০ খানা গোলা ঘরের মত ঘর। পাথরের উপর পাথর রেখে দেওয়াল, আর ওপরে পাতার ছাদ।

যাক, কিছুক্ষণ পরে পাহাড়ী এল। দেখলাম কৌঁচড়ে মোটা মোটা এক গাদা চাল।

হায় কপাল, ঐ কাঁচা চালগুলি খেতে হবে নাকি! পাহাড়ী করলে কি—হুমুঠো করে ঐ চাল প্রত্যেকের ধুতির কৌঁচড়ে বেঁধে দিল। তারপর শ্রোতের

জলে কৌচড় ডুবিয়ে বসতে বলল। আমরাও নদীর মাঝে বড় বড় পাথরে বসে পুঁটলি ডুবিয়ে বসে রইলাম। মাত্র তো এক হাঁটু জলও নয়।

মিনিট পাঁচেক পর পাহাড়ী ঐ চালগুলি দিবা খেতে লাগল। দ্বিধেয় তখন পেট চোঁ চোঁ—আমরাও আরম্ভ করলাম, বাঃ কি নরম, কি সুস্বাদু এই বিনা অগ্নিপক্ক ভাত! সত্যিই খেতে বড় ভাল লাগল, তৃপ্তিও হল।

এ আবার কি অদ্ভুত চাল! পাহাড়ী বললে বোড়া চাল।

আবার হন্টন। এবার ক্রমেই চড়াই। ছপাশে উত্তুঙ্গ পর্বত, মাঝে নাম না জানা নদী ক্রমেই যেন সরু হয়ে যাচ্ছে, আর বেগও যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ জল প্রপাতের আওয়াজ কানে এল।

পাহাড়ী বললে ঐ যে পাহাড়ের উপর থেকে জল প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে পড়ছে এটাই মহাকাল পর্বত।

অতি উৎসাহে কোমড় কসে এক রকম দৌড়েই পাহাড়ের কাছে গেলাম।

চেয়ে দেখি পাহাড়ের উঁচু থেকে জলের স্তম্ভ যেন লাফিয়ে পড়ছে নীচে।

কি তার দুর্বীর বেগ, কাছে যেতেও ভয় করছিল।

পাহাড়ী বললে চেয়ে কি দেখছ, দেৱী হচ্ছে, চল পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করি।

“চল, রাস্তা কই?”

রাস্তা আবার কই? এই জায়গা থেকেই উঠতে হবে। খাড়া পাহাড়, পা দিতেই লাল, গেকরয়া রংয়ের বালি ধসে পড়ে যাচ্ছে। কয়েক বার চেষ্টা করে সকলেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে হতোৎসাহ হয়ে পড়লাম। তখন দেখি কি, পাহাড়ীটি দিবা উঠছে। বটগাছের শিকড় ঝুলছিল, তাই বেয়ে বেয়ে বেশ চলে যাচ্ছে।

আমিও অনুকরণ করলাম, উঠেও গেলাম। হাত পা যা ছিঁড়ে গেল তা আর কাউকে জানালাম না। আমার পরে আমার দুই সাথী আরও এল। বাকি, চারজন, অঘোরে বিঘোরে প্রাণ দিতে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাল।

“আমরা এখানেই বসে আছি, তোরা পুণ্য করে আয়।”

তারপর পাথুরে জমি। চড়তে আর বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না।

প্রায় পাহাড়ের চূড়ায় মনে হল এসেছি—হঠাৎ দেখি সামনে ফাটল। মনে হল হয়তো বা ভূকম্পে পাহাড়টা মাঝখান থেকে ফেটে গিয়েছে। পাহাড়ী বললে মহাকালজী ফাটলের ওপারে। ফাটলটা এত গভীর যে নীচটা কেবল অন্ধকার, তল যে কোথায় বোঝবারও উপায় নাই। ফাটলটা ধরে চলতে লাগলাম, যদি কোথাও একটু স্বল্পপরিসর স্থান পাওয়া যায়। এক জায়গায় দেখা গেল বটগাছের শিকড় বুলছে ঠিক ফাটলটার উপরেই। পাহাড়ীটা নির্বিবাদে সেই বুলন্ত শিকড়ে দোল খেয়ে ওপারে চলে গেল। জিদ চেপে গেল। ‘যা থাকে কপালে’ বলে আমিও পাহাড়ীর অনুকরণ করে হুমড়ি খেয়ে পৌঁছে গেলাম ওপার। অবশিষ্ট পাহাড়ী আমায় ধরে নিয়েছিল। আমার বাকি সাথীরা বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে ওপারেই বসে পড়ল—“আমরা পাহাড়ী বা বাঙ্গাল নই, গোঁয়ারতুমী করে আত্মহত্যা করতে আসিনি।”

কি আর করা। পাহাড়ী, আর আমি এগুলাম।

কোথায় মন্দির। এতো পাহাড়ের চূড়া। সমস্ত চূড়াটা প্রকাণ্ড একটা পাথর। এত বড় যে নিজেই একটা পাহাড়। মনে হ’ল, কেউ যেন ওটাকে ইচ্ছে করে পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়ে দিয়ে গেছে। পাথরটা শেওলাতে, অকিড়ে ভরা।

পাহাড়ী বললে ওরই ভেতর নাকি মহাকালজী, ও নিজেও কখনও ভিতরে যায় নাই—শুনেছে। পাথরটা প্রদক্ষিণ করে আবিষ্কার করা গেল, এক জায়গায় বেশ বড় একটা ফাটল তাতে শুয়ে হাতের ভরে এগিয়ে যাওয়া হয়তো বা যেতে পারে।

ভিতর থেকে একটা বেশ গুসগুস আওয়াজও আসছিল। ভয়ে তো গলা অবধি কাঠ। কিন্তু ফিরে যাব ? আত্মাভিमानে আঘাত লাগছিল। পাহাড়ীটাও দেখলাম চুপ করে দাঁড়িয়েই আছে। হঠাৎ বললে “যেতে দেও বাবুজী, চল ফিরে যাই ?”

এই কথাতে জিদ চেপে গেল—“যা থাকে কপালে যাবই” বলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সাপের মতন ঐকিয়ে বেঁকিয়ে এগুতে লাগলাম। ঘন অন্ধকার সামনে,

কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ইঠাৎ সুরঙ্গটা একটা বাঁক মুড়লো। ইঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ যেন ঝলসে গেল।

পায়ে লাগল কার হাত। বুঝলাম পাহাড়ীও আসছে। একটু এগিয়েই মনে হল, এ কোথায় এলাম। এতো রাজপ্রাসাদ, প্রকাণ্ড যেন দরবার গৃহ। ছাদে পূব ও পশ্চিমে দুটো ফাটল। পশ্চিমের সূর্যালোকে ঘর ভরে গিয়েছে। দেয়ালগুলি ঝকঝক করছে। মনে হ'ল স্ট্রেলেকটাইট ও গ্রেনাইট এর স্তম্ভ। দক্ষিণে বড় পাথরটার একটা অংশ হয়েছে সুন্দর বেদী। সেই বেদীরই পাথরের একটা ভাগ বেশ বড় শিবলিঙ্গের রূপ আর শিবলিঙ্গের ডাইনে আর একটা ছোট চিবি। বড় লিঙ্গাকৃতি পাথরটার মাঝখান থেকে উঠছে জলের ফোয়ারা প্রায় এক ফুট ছড়িয়ে পড়ছে ছোটটির উপরে যেন স্নান করচ্ছে। পার্বতী পরমেশ্বরো! জলটা উত্তর দিকে এক অন্ধকার গহ্বরে ঝপঝপ করে পড়ে যাচ্ছে—মনে হল এই জলই বাহিরের জলপ্রপাত।

পাহাড়ী তো পাগলের মতন কেবল বেদীতে মাথা খুঁড়তে লাগল আর কি জ্ঞানি বিড়বিড় করে বলতে লাগল—অবোধা ভাষায়।

আমি তো বোধ হয় সখিং হারা হয়ে হারিয়েছিলাম।

ইঠাৎ কানে এল কান্নার সুরে চীৎকার করে কে যেন আমায় ডাকছে। বুঝলাম বন্ধুবর্গ শঙ্কিত হয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে।

মহাকালের পদ ধোত ঝরণার জল আকর্ষণ পান করে বিমুগ্ধ হৃদয়ে ফিরে এলাম। আসবার সময়ে কেমন করে খাদ পার হলাম, পাহাড় হতে নামলাম, কিছুই মনে নাই।

আসবার সময় একটু নাটকও হয়ে গেল। বক্সার ফোর্টের কাছে এসে গ্রেণ্ডার হয়ে গেলাম। বিনা পাসপোর্টে ভারতবর্ষে ঢুকছি আমরা। ফোর্টের ভিতরে নিয়ে এক ঘরে বন্দী হলাম। কিছুক্ষণ পরে বড় কর্তা জেনারেল সাহেবের দরবারে হাজিরা দিতে ডাক পড়ল। জেনারেল সাহেবকে কুনিশ করে, বোঝাতে যাব এমন সময় ওরই মধ্যে একজন নিশ্চয়ই খুব বড় অফিসার, পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, “তোরা কে? কোথেকে আসছিস?”

ধড়ে প্রাণ এল ;

তীর্থযাত্রার কাহিনী শুনালাম । “তোরা আমায়ও কেন নিয়ে গেলি না ?”

তারপর বড় কর্তারা নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করে হুকুম দিলেন,
আমাদের জন্ত চা, রুটি, মাখম, জেলী ।

তারপর আমাদের সঙ্গে স্টেশনেও এলেন । নাম জানলাম কর্ণেল চক্রবর্তী ;
দুর্গের বড় ডাক্তার ।

এখনও ডাক্তার সাহেবের সৌম্য, শাস্ত চেহারা চোখের সামনে ভাসছে ।

হে পরমেশ্বর,

স্বয়ম্ভু, মহাকাল,

জটাশির, চন্দ্রভাল,

গঙ্গাবারি দেও তুষা মিটাতে ।

রুদ্র, মহেশ্বর,

ভোলানাথ শঙ্কর,

শিখাও তোমারে প্রভু নমিতে ।

শম্ভুনাথ, বিশ্বনাথ,

আণ্ডতোষ, কাশীনাথ,

প্রকাশিত হও মোর ধ্যানেতে ।

শিব, ভুজঙ্গধর,

মহেশ বিশ্বেশ্বর,

কৃপা দৃষ্টি কর মোর পানেতে ।

ত্রিশূল, পিনাকধারী

তাণ্ডব নৃত্যকারী

দয়া কর ভয়ভীত মানবে ।

শূলপাণি, ভৈরব,

হর, হর মহাদেব,

নাশ কর পঞ্চেন্দ্রিয় দানবে ।

উমানন্দ, পঞ্চানন
 নীলকণ্ঠ, ত্রিনয়ন
 ব্যোমনাদ বাজাও না শিঙ্গাতে ।
 পশুপতি, বিশ্বপতি,
 কমণ্ডলু করধৃত
 শাস্তি বারি ছড়াও না জগতে ।
 মাগো মঙ্গলময়ী
 মাগো করুণাময়ী,
 তোমার চরণে মোরে
 শরণ দিও ।

যেখানেই থাকি আমি
 রাখিও চরণে টানি,
 চরণ ধুলার পরে
 মিশিয়ে নিও ।

মহাকাল জায়া,
 মহাকালী, উমা
 ভৈরবী, অভয়া
 এলোকেশী, ভীমা,
 আমার প্রণাম নিও ।
 দনুজ দলনী,
 পরমেশ্বরী,
 জগজ্জননী,
 দরশন মোরে দিও ।
 ছিন্নমস্তা, গৌরী
 অনূর্ণা, সতী
 চণ্ডিকে, শঙ্করী,

তারিণী পার্বতী,

করুণা নয়নে চেও ।

শিবে এলোকেশী

ভূগী, ধূমাবতী ।

বগলা, ষোড়শী,

শ্রামা, আত্মশক্তি,

তোমারে চিনিতে দিও ।

কমলা, অন্নপূর্ণা

কালিকা, ভবানী,

হর মনোরমা,

করালী ঈশানী,

কৃপা দৃষ্টি মোরে করো ।

তারা, আনন্দময়ী,

ত্রিনয়নী, দশভূজা,

মাতা, মুণ্ডমালিনী,

বাগ্মী, অপরাজিতা,

চরণ শরণে নিও ।

জন্মদিনে

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী

আজকে শুধু মায়ের কাছেই

ঘুরছে আমার মন,

মায়ের স্নেহ মাথিয়ে দেহে

দুই চোখে অঞ্জন !

আজ যেন মোর নতুন করে সৃষ্টি,

চোখে সবই লাগছে কেবল মিষ্টি,

চির চেনাও দিল নতুন দৃষ্টি,

দিল হরষণ !

আজকে শুধু মাকে ঘিরেই ঘুরছে আমার মন ।

দেহে মনে এসেছে আজ

আনন্দ-জোয়ার,

অস্তুর মোর আজ খুলেছে

বিশ্ব-প্রেমের দ্বার ।

হৃদ-দেউলে বাজছে মহাডংকা,

মুছে গেছে যত ভয় আর শংকা ;

প্রাণে কত না-বলা-আকাংখা

করছে যে নর্তন ।

দেহে মনে আজ এসেছে আনন্দ-প্লাবন ।

কী যে মায়া লেগেছে আজ
 ধরার মাটিতে,
 বৈশাখের এই রৌদ্র-মাখা
 সোনার কাঠিতে ।
 সারা আকাশ করছে কানাকানি,—
 'ঐ কে এলো, 'কে এল ওই'—বাণী
 চিরন্তনীর কাঁপছে ছায়াখানি,
 হাসছে দিগঙ্গন ।
 কী যে মায়ার স্পর্শে ধরা আনন্দ-মগন ।

এমনি দিনে আজ মা আমায়
 স্নেহের ইশারায়
 সকাল থেকেই ডাকছে কেবল,—
 'আয় না, ওরে আয় ।'
 মা যে আমার অনুভবের বিত্ত,
 প্রাণামৃত, মেলে কি আর নিত্য ।
 ধূলার কাজে লাগছে না তাই চিত্ত,
 লাগছে না মোর মন ।
 মন যে কেবল মাকে ঘিরেই ঘুরছে অনুক্ষণ ।

ষট্চক্রভেদের পরাবস্থা

মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট

আমরা স্থানান্তরে ষট্চক্রভেদের রহস্য* সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইলে ষট্চক্রভেদই প্রথম সোপানরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য, কারণ তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত দেহাত্মবোধের নিবৃত্তি হয় না। এই স্থূলদেহ এবং ইহার আনুযায়িক ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মা হইতে পৃথক্ জড় পদার্থ। মানুষের অহং-বুদ্ধি জন্ম হইতেই এই সকলকে আশ্রয় করিয়া অভিযুক্ত ও পুষ্ট হইয়া থাকে। যতক্ষণ দেহাদিতে আরোপিত এই অহং-বোধ দেহাদি হইতে মুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপের আশ্রয়ে প্রকাশিত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণত্বের পথে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা, পদার্পণও হয় না। এইজন্ত প্রস্থানভেদে যিনি যে প্রকার সাধন মার্গ গ্রহণ করুন না কেন অধ্যাত্মরাজ্যে প্রগতি লাভ করিতে হইলে তাঁহাকে সর্বপ্রথম নিজের অহং ভাবকে স্থূল অনাত্ম বস্তু হইতে মুক্ত করিতে হইবে। অবশ্য দেহাদি হইতে মুক্ত হইলেই যে বিশুদ্ধ মার্গে প্রবেশ লাভ হয় এমন কোনও কথা নাই। কিন্তু ইহা সত্য যে বিশুদ্ধ সত্য পথে চলিবার পূর্বে অহং-বোধকে দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধ করা আবশ্যক।

সাধকগণের পরিভাষা অনুসারে তৃতীয় নেত্র অথবা জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলনই দেহ হইতে অর্থাৎ দেহাত্মবোধ হইতে মুক্ত হইবার প্রথম নিদর্শন। ষট্চক্রের প্রতি চক্রেই এক একটি বিন্দু আছে। উহাই ঐ চক্রের কেন্দ্র এবং ঐ চক্রের অধিষ্ঠাতা চক্রেশ্বর ঐ বিন্দুতে অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রত্যেকটি চক্রেরই বহিরঙ্গ বর্ণময়। উহাকে প্রবুদ্ধ কুণ্ডলিনীরূপা চিৎশক্তির সাহায্যে বিগলিত করিয়া নাদে পরিণত করিতে পারিলেই চক্রস্থ বিন্দুর প্রাপ্তি সম্ভবপর হয়। তাহার পর ব্রহ্মনাড়ীর স্বভাবসিদ্ধ উর্দ্ধমুখী শ্রোতে উহার উর্দ্ধগতি সংঘটিত হয়। এই প্রকারে ছয়টি

চক্রেই বিন্দু প্রাপ্তি ও বিন্দুর উর্দ্ধগতির ফলে জ্রমধোর কিঞ্চিৎ উর্দ্ধদেশে প্রজ্জাচক্ষুর উন্মীলন হয়। এই অবস্থায় সাধক পঞ্চাশৎ বর্ষ ও উহা হইতে উদ্ধৃত নাদ অতিক্রম পূর্বক বিকল্পশূণ্য একটি বিশুদ্ধ জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জ্যোতিটাই বিন্দু, যাহা ভেদ করিয়া ব্যষ্টি জগৎ হইতে সমষ্টি জগতে প্রবেশ করিতে হয়। বিন্দু জ্ঞানাত্মক জ্যোতিঃস্বরূপ। উহাতে জ্ঞেয় ভাব সকল অভিন্নরূপে নিহিত থাকে। এই জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া ইহারই অন্তঃস্থিত শূণ্যকে আশ্রয় করিয়া যোগী বৃহত্তর জগতে প্রবিষ্ট হইবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ভক্ত ও যোগিগণ বুঝিবার সুবিধার জন্য বিশ্বকে ব্যষ্টি, সমষ্টি ও মহাসমষ্টি রূপে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ব্যষ্টি বলিতে একটি বিশিষ্ট নরদেহকে বুঝিতে হইবে। সমস্তগণের পরিভাষাতে ইহার নাম শিশু। সমষ্টি বলিতে ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝায়। অসংখ্য শিশুর সমষ্টিরূপী ব্রহ্মাণ্ডই সমষ্টিপদের অর্থ। ব্রহ্মাণ্ড-সংখ্যা অগণিত এবং অগণ্য। সমষ্টির দৃষ্টিতে এই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিই মহাসমষ্টিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই পর্য্যন্ত ত ভাব সৃষ্টির পরিসীমা। ইহার পর শূণ্য। ভাবময় কোনও সত্তাই সেখানে থাকে না। কিন্তু বলা বাহুল্য এই শূণ্য বা অভাবও সৃষ্টিরই অন্তর্গত।

ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে যাইতে হইলে একটি শূণ্য ভেদ করিয়া যাইতে হয়। তেমনি সমষ্টি হইতে মহাসমষ্টিতে যাইতে হইলেও শূণ্য ভেদ আবশ্যক হয়। এই নীতি অনুসারে মহাসমষ্টিকেও ভেদ করিতে হয়। মহাসমষ্টির অতিক্রম সিদ্ধ হইলে প্রকৃত চরমশূণ্যের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে।

যটুক্রেব ভেদ হইয়া গেলে সমষ্টি রাজ্যে বা সমষ্টি সত্তায় প্রবেশ ঘটে। মাতৃগর্ভস্থ সন্তান যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন ঐ মাতৃগর্ভই তাহার নিকট এক রাজ্য। কিন্তু মাতৃগর্ভ হইতে প্রসব লাভের পর সে আর মাতৃগর্ভরূপ পূর্ব রাজ্যে স্থিত হয় না। তখন যে বাহ্য কালের রাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই স্থলেও ব্যাপারটা কিয়দংশে সেইরূপ। যতক্ষণ আত্মা ব্যষ্টি দেহকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ যোগীর প্রথম লক্ষ্যই হয় ঐ অভিমানটি ভাঙ্গিয়া ব্যাপকতর রাজ্যে প্রবেশ করা। অভিমান কিন্তু ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গে না। কারণ

ব্যষ্টির অভিমান ভাঙ্গিয়া গেলেও তখন সমষ্টির অভিমান তাহাকে পাইয়া বসে। অথবা প্রকারান্তরে বলা চলে, সমষ্টির অভিমানে অভিমানী হওয়া ও ব্যষ্টির অভিমান হইতে মুক্ত হওয়া একই সময়ে সংঘটিত হয়। ইহার সারাংশ এই যে সাধক অথবা যোগী বট্টচক্রভেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মাণ্ডের অভিমানী হইয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ করিতে থাকে। ব্রহ্মাণ্ড অথবা সমষ্টি সত্তাতেও বট্টচক্রের দ্বারা বিভিন্ন কেন্দ্র স্থান আছে। পর পর ঐ সকল কেন্দ্র স্থানকে অবলম্বন করিয়া যোগীর চৈতন্য উন্মীলিত হইতে থাকে। এক পক্ষে এই গতি জ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত প্রগতি ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহার পূর্ব জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ এবং উক্ত রাজ্যে সঞ্চরণ সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে জ্ঞানের পরেও মহাজ্ঞান আছে। সমষ্টির পরেও যেমন মহাসমষ্টি আছে ইহাও কতকটা সেইরূপ। এইজন্য জ্ঞানরাজ্য হইতে নির্গম এবং মহাজ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ উভয়ই আবশ্যিক। জ্ঞানরাজ্য হইতে নির্গম পূর্ববৎ ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধদিকের বিন্দু ভেদ করিয়া ঘটয়া থাকে। উহাই ব্রহ্মাণ্ড-পুরুষের জ্ঞাননেত্রের উন্মীলন। পিণ্ডস্থ পুরুষের জ্ঞাননেত্রের বিকাশের সহিত ইহার অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। এই নেত্রের উন্মীলন না হইলে মহাজ্ঞানরাজ্য দৃশ্য পথে পতিত হয় না এবং তাহাতে প্রবেশ করিতে সামর্থ্য জন্মে না। মহাজ্ঞান রাজ্য বলিতে সৃষ্টির অঙ্গীভূত সমগ্র বিশ্ব বুঝিতে হইবে। মহাসমুদ্রে খণ্ড খণ্ড দ্বীপমালা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতি দ্বীপ সমুদ্রের জল দ্বারা চারিদিকে ব্যাপ্ত—এই অন্তরালস্থিত জলের অন্তরায় বশতঃ এক দ্বীপের সহিত আর এক দ্বীপের পরস্পর সন্ধক ঘটয়া উঠে না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অনন্ত সমুদ্রে অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ বিद्यমান রহিয়াছে। এই সকল দ্বীপের সংখ্যা-নির্দেশ সম্ভবপর নহে। এই মহাসমুদ্র বস্তুতঃ কারণ-সমুদ্রেরই নামান্তর এবং এই সকল দ্বীপের প্রত্যেকটি দ্বীপ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ। এই সকল দ্বীপের যে সমষ্টি তাহাই মহাসমষ্টি। ব্রহ্মাণ্ডের উর্দ্ধে আবদ্ধ হইয়া ঐ ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা হইলেও এই অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিরূপ মহাজ্ঞান-রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহার জন্য ব্রহ্মাণ্ডস্থিত পুরুষের জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড হইতে নির্গম এবং

অন্তরালবর্তী শূন্যভেদ করিয়া তৎতৎ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ আবশ্যক। এই মহাসমষ্টি এক হিসাবে “আদি সৃষ্টি” রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। যাহাকে কারণ-সমুদ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই বিরাট আকাশ, যাহাতে নক্ষত্রপুঞ্জের আয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে।

বলা বাহুল্য, এ পর্য্যন্ত অজ্ঞানের খেলা পূর্ণভাবে বিদ্যমান। অবশ্য ব্যষ্টির অজ্ঞান হইতে সমষ্টির অজ্ঞান সূক্ষ্ম এবং সমষ্টির অজ্ঞান হইতে মহাসমষ্টির অজ্ঞান আরও সূক্ষ্ম। কিন্তু সূক্ষ্ম হইলেও অজ্ঞান অজ্ঞানই। মহাসমষ্টির অজ্ঞানই মূল অজ্ঞান। মহাসমষ্টি দেহে অভিমানী পুরুষই আদি জীব। ইহাই একমাত্র জীব। ইহার পর আর জীবভাব থাকে না। এই এক জীবই প্রতিবিম্বটি ভেদে অনন্ত জীবরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মহাসমষ্টির অতিক্রমে যে জ্ঞানের বিকাশ হয় তাহাই পূর্ণ জ্ঞান। বাস্তবিক পক্ষে তাহাই যথার্থ আত্মজ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে আত্মাতে যে অহং প্রতীতির উদয় হয় তাহাই পূর্ণ অহং। এই অহং-এর প্রতিযোগী অন্য কোনও অহং থাকিতে পারে না। দুর্গা সপ্তগতীতে আছে—

“একৈবাহং জগতাত্ৰ দ্বিতীয়া কা মমাপরা”—ইহা এই অদ্বিতীয় জ্ঞানেরই সূচক।

কারণ সমুদ্রের ওপারে না গেলে এই অদ্বিতীয় অহং প্রতীতি লাভ করা যায় না। কারণ এই অদ্বৈত অহং-ভাব বিভক্ত হইয়া সৃষ্টিকালে অহং ও ইদংরূপে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নামে দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়। এই দুইটি ধারা থাকা পর্য্যন্ত অন্তরালে শূন্যের অবস্থান অবশ্যসম্ভাবী। এইজন্য জ্ঞানের পূর্ণতার পক্ষে পর পর সকল শূন্যই ভেদ করিতে হয়। আপাততঃ আমরা তিনটি শূন্য গ্রহণ করিয়াছি—শূন্য, মহাশূন্য ও অতি মহাশূন্য। কিন্তু প্রয়োজন হইলে বৃদ্ধাইবার সুবিধার জন্য শূন্যের সংখ্যা বাড়ান যাইতে পারে। কিন্তু শূন্য যতই হউক না কেন অতি মহাশূন্যের পর আর শূন্য নাই। কেহ কেহ ইহাকে আত্যন্তিক শূন্য এবং অনন্ত শূন্য বলিয়া থাকেন। দ্বৈত দৃষ্টিতে এই চরম শূন্যের ভেদ হয় না এবং সেইজন্য চিৎ ও অচিতের সমন্বয় এবং জীব ও ঈশ্বরের একত্ব-প্রতীতি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু যে জ্ঞানী বা যোগী এই অন্তিম শূন্যকেও ভেদ করিতে সমর্থ হয় সে

স্বভাবতঃই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া থাকে, কারণ সেখানে একমাত্র অহং ভিন্ন ইদং-এর কোনও স্থান থাকে না। এই পরম রাজ্যে প্রবেশ করার যে দ্বার তাহার নাম ‘ভ্রমর গুহা’। ভ্রমর গুহা চরমশূন্যের পরে এবং পূর্ণ সত্যের পূর্বে অর্থাৎ উভয়ের সন্ধিস্থানে অবস্থিত। ভ্রমর গুহা ভেদ হইয়া গেলে প্রকৃত সত্যরাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে। ব্যাপ্তি, সমষ্টি এবং মহাসমষ্টি সবই কালের রাজ্য এবং কালের নিয়ন্ত্রণের অধীন। কিন্তু সত্যরাজ্য যথার্থ গুরুরাজ্য। কালের রাজ্যে মন ও মায়ার খেলা থাকিবেই এবং সৃষ্টি প্রলয়ের বিভিন্ন প্রকারের লীলাও অবশ্যসম্ভাবী। সেখানে আলো-আঁধার দিবা-রাত্রি সব দ্বন্দ্ব অবস্থান করে। কিন্তু গুরুরাজ্য দ্বন্দ্বাতীত। সেখানে দিবারাত্রি নাই, সৃষ্টি সংহার নাই এবং চিৎ অচিতের বিভাগও নাই। সেখানে কাল নাই। তবে হ্রাদিনীশক্তির খেলার জন্ত আনন্দের আশ্বাদনের জন্ত নিত্য গুরুর অধীন তাহার কিঙ্কর রূপ কাল আছে। কালের রাজ্য কার্য্য-কারণ-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা ত্রায়ের রাজ্য। কিন্তু গুরুরাজ্য স্বাতন্ত্র্যময় স্বাধীনতাময়—উহাই প্রকৃত স্বরাজ। উহা প্রেমের রাজ্য—মহাকরণার রাজ্য। বস্তুতঃ যাহা প্রেম তাহাই কালের দিকে দৃষ্টিপাত সহকারে মহাকরণা রূপে পরিণত হয়। এই গুরুরাজ্যেরও অনন্ত বৈশিষ্ট্য আছে। এই প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক।

চিঠি

দূরের বন্ধু, ভাই !

মোদের মায়ের জন্মদিনের কিছুটা শুনায়ে যাই ।

তখনো তপন মেলে না নয়ন, ওড়ে না সোনার পাখী,
 উষা-কীর্তন নির্জন-পথে মেতে ওঠে থাকি থাকি ।
 প্রাসাদে কুটীরে খুলে যায় দ্বার, ফোটে আলোকের তারা,
 পোহায় রজনী পশে শুভদিন, উৎসবে মাতে পাড়া ।
 ওঠে কোলাহল, আসে জনদল,—বস্ত্রার শ্রোত যেন
 কে পারে কি কয়, শত প্রয়োজনে ছোট্টে উন্মাদ হেন ।
 ডুম ডুম রবে বেজে ওঠে ঢাক, ওঠে শঙ্খের রোল,
 আসে ভারে ভারে ফুল পল্লব, ঘন লাগে প্রাণে দোল ।
 কত মহারাজা, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, তুচ্ছ ভাই
 মায়ের পূজার করে আয়োজন, কেহ বুঝি বাদ নাই ।
 ওদিকে অদূরে আশ্র-মুকুল মাধুরী বিলায়ে যায়,
 কাঁঠালী চাঁপার মুহু সৌরভ ভাসে আকাশের গায় ।

দিন হয়ে এলে সারা,

সন্ধ্যা ঘনায় ফুটে ফুটে ওঠে আলোকের গ্রহ তারা ।
 পুষ্প পাতায় কস্তুরী-ধূপে মাতে পূজা প্রাঙ্গন,
 তারে ঘিরে ঘিরে এঁকেবেঁকে চলে চন্দন-আলিপন ।
 সে আলিপনার কত যে মাধুরী কেমনে তোমারে কই,
 দূরের বন্ধু, যত দেখি তারে নির্বাক হয়ে রই ।
 ওদিকে সাজায় নৈবিদ্যের থালি শত ভারে ভার,
 মিষ্টান্নের কত আয়োজন, গণনা কে করে তার ?

বিবিধ বর্ণ-গন্ধ-পুষ্প আসে সেথা রাশি রাশি ।
 বিকিমিকি আলো । পূজা প্রাঙ্গনে খুসী বলমল হাসি ।
 এই ছনিয়ায় রয়েছে যেথায় যতক তীর্থ-ঠাই,
 কারো আসে নীর, আসে রজঃ কারো, কারো শাখা-পাতা চাই
 মা যে আমাদের বিশ্ব-শরণ, তাই পূজা উপচার
 সকলের সব দিয়ে গড়ে ওঠা পূর্ণের সম্ভার ।

হয়ে আসে শুভক্ষণ,
 পূজার লগন যেমন ঘনায়, শাঁখ বাজে ঘন ঘন ।
 ডিম্ ডিম্ বেজে ওঠে ছন্দুভি, উল্লাসে মাতে গান,
 বিনিকি-বিনিকি বাজে থঞ্জনী, আকুলিয়া তোলে প্রাণ ।
 অন্ধ-তামস কোথা যার ছুটি, তন্দ্রা জড়িমা টুটে,
 বন্ধের মাঝে ঘন উল্লাস ছয়ার ভেদিয়া লুটে ।
 আসেন জননী, শিরে শোভে চূড়া, সজ্জিত ফুলহারে,
 সুস্থিত হাসে, বন্ধের মাঝে কর-পল্লব জুড়ে ।
 অতি অপরূপ মায়ের সে রূপ, ললাটে স্নিগ্ধ কান্তি,
 নয়নে ঝলিছে করুণা কিরণ, দেহ-মনে লাগে শাস্তি ।
 ওঠে বেদগান । চলে পূজা তাঁর । নির্বাক সভাতল
 শ্রীতি ও প্রেমের মিলিত ধারায় সভা করে ছলছল ।
 ক্রমে নিভে আসে রাত্রির শিখা, দিনের আলোর লাগি'
 উৎসব বীণা বিধে ছড়ায় দূবের পরশ মাগি' ।

দূরের বন্ধু, ভাই !
 মোদের মায়ের জন্মদিনের কিছুটা শুনায় যাই ।

ইতি—

মায়ের বিছাপীঠের বন্ধুরা



ওঁ মা

পরম আনন্দের সংবাদ এই যে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর ৬৪ তম শুভ জন্মোৎসব আগামী ৩রা মে হইতে ২৬শে মে, ১৯৫৯ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, কিশনপুর, দেৱাতুন অল্পুষ্ঠিত হইবে। এই উৎসবে শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র উপস্থিতি আশা করা যাইতেছে।

মাতৃভক্ত সন্তানগণ এই উৎসবে সন্মিলিত হইয়া আনন্দ পরিবেশে আনন্দ লাভ করিবেন এই অনুরোধ।

সভাপতি

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ

শুভ জন্মদিন—১৯শে বৈশাখ, ৩রা মে।

শুভ জন্মতিথি পূজা—১০ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে মে, রাত্রি ৩-৩০ মিনিট।

(২৬শে মে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে)

যাঁহারা বাহির হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অন্ততঃ সাতদিন পূর্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় সংবাদ দিয়া বাধিত করিবেন—

স্বামী পরমানন্দ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

কিশনপুর, পোঃ রাজপুর, দেৱাতুন।



By courtesy of Sardar Jogendra Singh, I. F. S.

The ONE who is the Eternal, the Atman,
 He Himself is the traveller on the path of Immortality,
 He is all in all, He alone is.

MATRI VANI *

(*Replies to letters from different people at different times.*)

144.

While one is still guided by reason there is always the possibility of straying from the right course. So long as one has not realized that He and He alone is manifest in all modes of being, in all forms and in the formless, single-mindedness and unswerving faith are indispensable. Such one-pointed devotion must have for sole aim the revelation of the Beloved. Living among your people in a spirit of service be helpful to everybody.

145.

Twice daily when performing your morning and evening worship (*sandhya*) dedicate your *japa* to the Lord by the prescribed formula. At other times of the day when doing *japa* to further your spiritual progress such dedication is not necessary. But when at any time you decide to do a certain, previously fixed amount of extra *japa*, then this should be formally consecrated to Him after completion. While walking or moving about, while eating or sleeping, while doing no

* The Bengali original appeared in Ananda Varta, Vol. VI/4, p. 257.

matter what, try to sustain in your heart the remembrance of God in the shape of your *mantra*.

146.

How much *karma* from former births remains yet to be worked out ! Just as when for example someone has ruined his digestion by indulging in excessive and unrestrained eating ; even though he later adopts a frugal and well-regulated diet, the results of these wise measures will not be noticeable straight away. Thus : whatever be the nature of one's actions at the time, one also has simultaneously to enjoy and suffer the accumulated consequences of one's previous conduct. In God's Creation there is perfect justice. Generally speaking man is born into this world in order to reap the pleasant results of his good deeds as well as the outcome of his wrongdoing. What about the consequences of any impropriety or injustice he commits at the present time ? He will of course have to endure them. Man enjoys the fruits of his accumulated former good works, but he will also have to suffer the effects of his evil deeds. The Almighty's Will is being fulfilled. Man must foster the desire to perform right actions, yet even the impossible becomes possible by God's Will : let His Lotus-feet be your sole refuge !

147.

The following are some questions which a European lady wrote to Mataji and Mataji's replies.

Question : Since the religious conception is the highest, the only goal in life, what becomes of those who do not attain to it in their life time ?

Mataji : They have to continue in the realm of death, which is the ceaseless round of birth and rebirth ; whereas those who attain to the Goal of human existence realize Immortality.

Question : Since our only reason for living is to return to that from which we came, why is there this life, why were we separated from this Being ?

Mataji : Everything is His Will, He is absolutely free, He is His own law. This coming and going is His very nature, His dispensation. He Himself plays with Himself, everything is He and He alone.

Question : Will man ever destroy this world and himself ?

Mataji : Man has certainly not got the power to create, preserve or destroy. In Him, whose Play all this is, all possibilities are contained. The destruction of one's own self virtually amounts to the destruction of the universe. Where this self is, there the world exists. To be destroyed lies in the very nature of that which is of the world and therefore perishable ; it has ever been destroyed, it is being destroyed and it will be destroyed. But where He is and He alone, who is to destroy whom ? There the question of destruction cannot arise. Where is He who is THAT SELF ? Find out ! The SELF is not subject to destruction. The ceaseless endeavour to know THAT SELF is man's bounden duty.

Question : Is there no love between mortals or must all love be first for God and then love for another being ?

Mataji : Between individuals true, unadulterated love or fondness is impossible. Where love or affection has

grown perfect this question cannot arise, for in such a case who is the beloved ? God and God alone.

148.

In all forms, in all diversity and disparity He alone is. The infinite variety of appearances and manifestations, of modes of becoming and states of being, of species and types, all the numberless distinctions as well as all identity are but HE Himself. With whom are you then angry ? Whatever anyone says is according to his stage and condition at that particular time and therefore right for him. Surely, he is only demonstrating what he perceives and understands at that point of his development. This also is but an expression, a guise of the ONE.

149.

A person who expects this body to be always super-normal in its dealings with the world, will be disappointed : for this little girl (Mataji) acts according to her *kheyal*—whatever it be at any time. In other words accept what little service you may be able to receive from this child. In what light anyone sees this little girl depends on his ideas and attitude of mind. To her everything appears delightful.

*

*

*

*

If you can give your undivided attention to the Goal and remain concentrated on it with unwavering steadiness, you will hold your ground in spite of everything that may be opposed to it. The kind of world in which one lives and the company one keeps in that particular world will naturally

exercise powerful influences on one's mind and character. When one has entered into close contact with one's Real Guru provided He has let this close relationship be established—then the responsibility for one's actions rests no longer with oneself, for He can do everything. In what manner He may choose to impart His teaching to a particular person ;—for sometimes a child is taught to walk by catching hold of His hand and at other times by being left to himself,—the aim will always and in every case be the same, for the disciple is the Guru's very own. He Himself selects the method by which to draw His children close to Himself, the method that is best suited to each one. Such is His own free and absolute Will. Those who, taking the responsibility upon themselves, wish to judge from their own level, will reap the consequences of their way of proceeding. Quite obviously it is difficult for the ordinary person to understand all matters, for he does not know what course of action is right for which purpose. This is why the ONE appears to him in the form of disappointment and failure.

SHREE ANANDAMAYEE

A SIGNIFICANT MANIFESTATION OF ECSTATIC GOD-CONSCIOUSNESS

SWAMI SIVANANDA, RISHIKESH.

Shree Anandamayee is one of the finest flowers of the Indian mystical life ; she is the best image to contemporary consciousness, of the silent and radiant greatness of a God-intoxicated individual. In her we find the brooding East brought into a dynamic realization, in everyday life, of the transcendental states of spiritual awareness and being. She is one of the most shining diamonds in the luminous crown of contemporary Indian spiritual life. May She live amidst us, longer and yet longer and continue to spread by the very mere act of her living, abundant joy and peace ! May the Almighty Lord grant her health and strength and preserve her amidst us, for many many more summers to come !

ANANDA TATTVA

DR. ROMA CHAUDHURI,

Principal, Lady Brabourne College, Calcutta.

A general notion amongst Westerners regarding Indian Philosophy is that it is wholly pessimistic in nature, and as such, has rather a baneful and depressing influence on life. This idea has gained ground abroad because of the famous Buddhist maxims, accepted by all the systems of Indian Philosophy as their very starting points, viz. "*Sarvam Duhkham Duhkham*", "*Sarvam Ksanikam Ksanikam*"—"Everything is Sorrow, Sorrow", "Everything is Transitory, Transitory." But the point to note here specially is that this Pessimism of Indian Philosophy is only initial, never final. As a matter of fact, it is a preliminary kind of healthy Pessimism, which instead of depressing the individual concerned and damping his energy and enthusiasm, rather stimulates him to a greater effort, and encourages him to get rid of his present defects which alone are responsible for his present sufferings.

Thus, it is never the contention of Indian Philosophy that the universe is a place of eternal sorrows and sufferings, that it is impure and imperfect through and through, that man is inherently sinful, selfish, weak and small. On the contrary, the holy sages of this holy land of ours, at the very dawn of human civilisation, saw the sublime vision of a Universe in which the Universal Self has embodied itself.

What or who is this Self or Soul or *Atman*? This *Atman* is, first *Prāna*, the Eternal Life behind all apparent mortality and destructibility, as found in the world. Thus, according to the Indian view of creation, God is not a distant Creator, who creates the world from outside out of Primal Matter and then leaves it off to itself, as absolutely separate and different from Himself. On the contrary, the Primal Matter or *Prakriti* is nothing but a *Shakti* of God Himself, it is nothing but the *Achit-Shakti* of God, and the material world is

nothing but the manifestation of God's *Achit-Shakti*. In the very same manner, individual souls are manifestations of God's *Chit-Shakti*. In this way, the same God, the same *Prāna*, the Eternal Life is throbbing in infinite glory in every nook and corner of this vast and variegated Universe of souls and matter. In this way, to a discerning Indian, the whole Universe is a living entity, pulsating with the Life of the Source of all lives. This is the real idea behind Indian theories of Nature-Worship and Image-Worship. If the Universe be the *Parināma* or transformation of God Himself then any and everything on earth is God Himself—every particle of dust is God, every drop of water is God, every blade of grass is God. Hence, our *Upanisads* have declared beautifully :—

“Whatever is there in this world, emanates from *Prāna* and throbs in the *Prāna*” (*Katha Up.* 6. 2.)

“*Prāna* is *Brahman*. So, all beings arise out of *Prāna*, is sustained by *Prāna* and return to *Prāna*.” (*Tattiriya Up.* 3. 3.)

Thus, the Universe is not a lifeless, mass of Matter, but a visible embodiment of Life Eternal which alone laughs in the light of the sun and the moon, dances in the ripples of rivers and falls, frolics in the beauty of flowers and foliage—what all these are besides the joyous exuberance of the *Prāna* of *Brahman* ?

This *Prāna*, this Life Eternal, is at the same time *Saundarya*, Life Beautiful. In fact, what is living, what is full of energy, can never be ugly or disharmonious, death is ugly, lack of energy disharmonious, but where there is life, there is beauty ; where there is energy, there is harmony. That is why, the Universe is not only living, but is also beautiful and harmonious.

Again this *Saundarya*, this Life Beautiful is, at the same time, *Ananda*, Life Blissful. “A thing of Beauty is a Joy for ever.” Beauty brings its own Joy is, in fact, Joy in essence.

Thus, Life, Beauty and Bliss, *Prāna*, *Saundarya* and *Ananda* are identical. And the sublime “*Ananda-Tattva*” of Indian Philosophy

is first and foremost, nothing but this Trinity, this Unity of Trinity. Further this *Ananda*, thus implies serenity. Bliss is eternal and ever-flowing, Bliss is ever-full and exuberant, yet Bliss is never effusive, unstable, sprightly. This calmness, this stability is a result of its fulness and depth. What is full, what is deep, what is sublime is also serene. Hence, just as there is nothing lifeless, nothing ugly, nothing sorrowful in the world, so there is nothing fickle, nothing gushing, nothing perturbed or disturbed in it.

Finally, crowning all, *Ananda-Tattva* implies Purity, *Suchitā*. Nothing can live, nothing can be beautiful and blissful and serene, if it be impure. For, impurity is something self-inconsistent, self-contradictory, it involves an exception to the course of Nature, a violation of her order, a contradiction of her inner, harmonious essence.

This five-pointed *Ananda-Tattva* is, indeed, one of the most exhilarating philosophical doctrines of the world. For, it is a Doctrine of Progress, the greatest incentive to all to rise above the present lifeless, inert and, static existence to a state of *Eternal Life*; from the present ugly, disharmonious and unsystematic existence to a state of *Eternal Beauty*; from the present sorrowful, depressing, and hopeless existence to the state of *Eternal Bliss*; from the present unstable, fickle and ever-busy existence to the state of *Eternal Serenity*; from the present impure, lowly and narrow existence to a state of *Eternal Purity*. In fact, the life we are leading now, the world we are inhabiting now, are only distortions or concealment of our real life, of the real world. The aim of *Sādhana* is to enable us so get rid this distortion, this Concealment, and *Ananda-Tattva* is, thus, the greatest *Sādhana* of our lives. It enables a man to realise the inherent greatness of his own nature, to be "*Amritasya Putra*" or "son of Immortality" in the truest sense of the term, nay, even more—to be himself one with the Immortal Being. Contraction is Pain, Expansion is Bliss. Hence, this Expansion of Life, this Fulness of Nature, this Perfection of Existence is *Ananda*—*Ananda* is its beginning, *Ananda* is its end; *Ananda* is its cause, *Ananda* is its effect;

Ananda is its be-all and end-all, *Ananda* is its essence and manifestation. Fortunate, indeed is the man who, in this way, in *Ananda* and through *Ananda* realises the infinite *Ananda* of his own nature.

Thus, this *Ananda-Tattva* is nothing but *Bhūmā-Tattva*, as declared by our own *Rsis*, right at the dawn of human civilisation—“What is *Bhuman* or Great alone is *Sukha* or Bliss. There is no *Sukha* or Bliss in *Alpa* or Small. The *Bhuman* or Great alone is *Sukha* or Bliss, Know the *śhūman* or Great alone” (Chāndogya Upanisad 7, 13, 1.)

Let us end this short account of *Ananda-Tattva* with a similar, exhilarating Ode to Humanity, re-echoed in the thundering voice of a modern saint—

“Never forget the glory of Human Nature. We are the greatest Gods. Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which *I am* !” (Vivekananda).

The Malady of the Age, its cause and cure*

Dr. B. L. Atreya, M.A., D.Litt.

PADMABHUSHAN, KNIGHT COMMANDER, DARSHANACHARYA.

Honoured Guests, Members of the Reception Committee & Fellow Delegates,

I am very thankful to the Executive Committee of the Indian Philosophical Congress for the honour it has done me. I feel diffident in occupying this chair, which has been, in the past, occupied by distinguished thinkers of India. My only justification for being here is that it is another opportunity for me to serve the great organization of which I have been a member since its very inception, and which I have served as a Joint Secretary and Treasurer for the last six years and as a Sectional President for two sessions.

Ladies and gentlemen ; We are living in a very strange age today. Whereas our knowledge of the external world, and our means of securing mastery over it are increasing by leaps and bounds, our acquaintance with the inner nature of man and his aspirations, powers and potentialities is decreasing. We are more worried about wealth, power and possessions than about the right use we should make of them and the purpose they should serve. Although, thanks to science and technology, the world is becoming one and its parts more and more interconnected by economic and political ties, mankind is becoming more and more divided into political blocks, parties and groups. A cold war is going on everywhere. Even families are breaking up. While all nations and communities are talking of peace, goodwill, co-existence and non-aggression, they are preparing for war under the cover of defence. Power-pacts, military aids, and federations for mutual protection are common. There is a keen desire for independence all over the world, still all small and weak

* Presidential Address delivered at the XXXIII Indian Philosophical Congress, 1958.

countries are becoming more and more dependent on the resources of big ones and appending themselves to more powerful ones, risking their own freedom of thought and action. While old castes and communities are breaking up and vanishing, new political castes and communities in the name of parties and groups are springing up, generating greater difference, hatred and enmity than the older divisions ever did. All kinds of propaganda, mostly false, are made use of for lowering others in the estimation of the ignorant masses and securing support for oneself and one's party. While nations talk of *Panchashila*, individuals and political parties within a nation cast to winds all the time-honoured principles of *sheela* (good conduct).

In place of self-control, control over others' property and resources has become the desired end of clever individuals. In this age when much public harm can be done by negligence of one's duty and when countless lives can be jeopardised thereby, negligence of duties has become common. Most accidents in buses, trains and planes are said to be due to this factor. We care more for rights than for duties. Stability has given place to revolution, obedience to revolt, co-operation to competition, harmony to discord, contentment and meekness to ambition and aggression. Administration being carried on by those who are appointed on key-posts on account of party-allegiance, and not on account of adequate qualifications, there is mismanagement, partiality, injustice and dissatisfaction everywhere. Even commodities essential for existence and health are becoming rare, difficult to obtain, and costly beyond expectation. Every body tries to put the highest price on what he possesses and can supply to others. Even when it is purchased at the highest price, the buyer is never sure of the genuineness of the article, for adulteration has become a common practice. Food-materials, medicines, and even the free gifts of nature—air and water—are being adulterated and contaminated on account of the cupidity of those who observe no moral principles, and who are neither afraid of God nor of the Law of Karma, simply because they have ceased to believe in their existence and operation.

The common man is now living more or less a vegetative and

animal life, and is more concerned with food, clothes and house than with any higher and deeper problem of life. And even those he is not able to secure with ease. No one has initiative and freedom to think and live independently. His thoughts and life are controlled by party-affiliation, and unconsciously guided and determined by newspapers, radio and cinema. Life has lost value and sanctity. Regimentation, conscription and compulsion are coming into vogue in every country. Man has lost faith in religion, in morality, and even in himself. He is pessimistic, pleasure-seeking, secular, party-minded, money-minded, amoral, confused, nervous, quarrelsome, explosive, exploitative, and restless. He has little respect for life, private property, age, wisdom and woman. Life is meaningless, purposeless. Its only business is to eat, drink and be merry. Money being able to purchase all pleasures and comforts, it has become the only object of pursuit throughout life. Our happiest moments are only those when we enjoy the pleasures of senses. Those who are not fortunate enough to secure them continuously and in abundance try to forget their very existence by the help of anaesthetic drugs. Much of our vital and nervous energy having been exhausted on account of over-work and over-enjoyment, we seek the help of stimulants. Our social life is in a chaotic condition. All respect for parents, teachers and administrative authorities has vanished. Either there is too much of regimentation and police control or every individual is a law unto himself. Where the former exist, fear and anxiety are common, and where the latter, social anarchy prevails.

Many western thinkers (and some eastern too) attribute the present unsatisfactory state of the world to modern science and technology. Tyrrell, for example, writes in *Man the Maker*, "The scientific perspective is hopelessly out of focus with reality and the philosophy to which it has given rise is useless as a guide in life" (p. 291). "The central feature of the modern outlook is, however, the belief that the universe is without purpose or meaning, without directing factors, without anything which transcends the range of our senses and our powers of intellectual investigation. Man, it is asserted owes his origin to the forces in the physical world which lie within

the range of his observation. There is nothing beyond this. There is nothing teleological or supra-teleological." (p. 293). About the advance made by technology, he says, "These achievements are not simple steps to Paradise. They are blessings; but they have repercussions.....They make life too complex for peace of mind. They have increased the speed of living to such an extent that there is no time to look beneath the rapidly moving surface and to reach firm foundations." (p. 27). "The urgent need of our times is not for more and more science but for clarity of vision which will enable us to raise our eyes from the foreground and to realize something of the importance of those things which lie in the shadow*must* see the whole in true perspective and not any longer build on the flat screen which the specialized technique of science has created" (p. 304). Alexis Carrel similarly writes in his well-known book, *Man the Unknown*, "No advantage is to be gained by increasing the number of mechanical inventions. It would perhaps be well not to accord so much importance to the discoveries of physics, astronomy, and chemistry. Man must now turn his attention to himself, and to the cause of his moral disability.....There is no shadow of doubt that mechanical, physical and chemical sciences are incapable of giving us intelligence, moral discipline, health, nervous equilibrium, security and peace" (p. 50). Gerald Heard writes, in his work *The Source of Civilization*, "The ship of our civilization goes now with so great and so growing a list that we are compelled to throw any ballast we can on the other side." (p. 239). "Our dangerously disproportionate advance in physical knowledge and power over means" (p. 239), he says, "must be counterbalanced by psychological knowledge, knowledge of that complementary aspect of reality which can only be obtained through our subjective, common, integrated depth of consciousness" (p. 391). "A psychological revolution is therefore our only escape from material destruction and mental derangement." (p. 421).

We have to consider these opinions very seriously in view of the fact that in our country, where science and technology are not yet sufficiently advanced, there is a cry for more and more of science and technology; and science, scientists, and science teachers and students

are being patronised by our state in the same way as poets and philosophers were patronised by kings in the past.

There is no doubt that technology has given unimagined and unprecedented power to man ; and this power is a double-edged weapon. It can be used both for good and evil, and it has been used in the recent history of the world more for evil than for good. Automobiles, aeroplanes, atomic power, telephone, film, fire-arms, anaesthetic drugs, bacteria, hypnosis, suggestion, scientific methods of propaganda—all are capable of being used with equal advantage by the benefactors of mankind and by antisocial individuals and groups. The police and criminals vie with each other in making use of the same means in trying to defeat each other's purpose. If today the world is enjoying the benefits of technology, it is as much suffering from its harmful effects. It is, however, not the fault of technology that it is misused. It is that of those who misuse it. Neither power nor possession of it is evil. It is but natural for man to crave for power. The evil lies in the misuse of it. As Shakespeare said long ago, "It is excellent to have a giant's strength ; but it is tyrannous to use it like a giant "

Technology is science in use and action. It is a natural outcome of the present-day advancement of science. All knowledge is power. Much more the scientific knowledge of nature. There is nothing wrong with science as such. Science has penetrated deep into the secrets of nature and life, and has given us exact knowledge of most of the things and happenings around us. Knowledge being power, man is more powerful today than ever before. He has conquered space and time : neither oceans nor mountains nor even clouds offer any barrier to him. He can fly not only to any place on the earth, but also to any place within the earth's atmosphere. Nay, he is likely soon to land on the Moon or the Mars. His voice can be heard instantaneously at any place in the world, and even far away from it. He has at his disposal enormous electrical, atomic and solar energy with which he can reshape the world or destroy it in no time. Medicine and surgery are now capable of performing miracles, and no disease is now regarded as incurable. Large areas of earth which were

formerly sterile have been made fertile and habitable. In short, science has given us mastery over Nature. How can man part with the knowledge and power he has acquired? How can he cease to have a craving for more and more knowledge and power?

It is really not science, pure or applied, that is to blame for our miserable plight, but a particular outlook or philosophy of life based on the findings of some of the physical sciences. This great success science has achieved is due to the self-imposed limits within which it has worked. Science has confined itself to the knowledge of impersonal facts of objective experience, and has tried to formulate a working thought-model of the world around us with the help of the intellect working on the data collected by verifiable and shareable observation and experiments. It is satisfied with description, classification, and explanation of one phenomenon in terms of other intelligible phenomena. It tries to avoid all reference to unverifiable ultimate realities and to human feelings and values. It tries to reduce the variety of its data to a common denominator which may be amenable to mathematical calculation and formulization. Our objective world, which is in itself an abstraction from our total experience, being vast and varied, scientists had to approach it piecemeal; and this division of labour gave rise to a large number of sciences dealing with the different aspects of nature but following more or less the same method of investigation. Success was inevitable and humanity came to possess greater and greater theoretical and practical knowledge in narrower and narrower fields of experience. Thus we have today experts and specialists who have greatest acquaintance with minutest things and who know very little about other things in the world. They are apt to see the whole world with the glasses coloured by their experience in the narrowest field of nature.

Scientists, students of science, and common men affected by science, are, after all, human beings. They have problems, theoretical as well as practical, which extend beyond the narrow limits of science and which press for their solution. There are certain questions which every human being, unless he is an idiot, likes to be

answered. Some of them are : What am I ? How am I related to the world and to other beings in the world ? What happens to a person when he dies ? Is my birth an accidental coming into being ? Why inequality and differences in men ? Is there any purpose or goal which I should strive to attain here or hereafter ? Are some actions right and others wrong, and do they effect me favourably or unfavourably ? Am I free to make a choice between two courses of action open to ? Is nature or the universe hostile, indifferent, kind or benign to man ? Is there any intelligence behind the processes of nature ? Was the world ever created by some intelligent being ? If so, what is its nature and powers, and how is it disposed towards its creation and the creatures therein ? What is the ultimate nature of the stuff of which the world is made ? Is it one, two, or many ? If two, or many, how are they related ? If one, how has the plurality and variety been created ? What is knowledge ? How is the subject of knowledge related to objects ? When is knowledge regarded as valid ? Is there anything like Truth, Goodness, and Beauty ? Is life worth living ? What is happiness ? Can it be attained ? If so, how ?

Genuine scientists who are experts and specialists in their own particular fields and who are too busy with their special problems plead ignorant and refuse to answer such questions. Pseudo-scientists, fanatic admirers of science, and scientists who go out of their way, do attempt to answer them or some of them. But their answers are coloured by and soaked in the limited knowledge of a particular aspect of nature or life, with which they are specially acquainted. The basic sciences—mathematics, physics, chemistry and biology—deal with only physical entities, forces, forms, qualities and the laws governing them ; and, therefore, an outlook of life and universe built around their findings cannot but be materialistic. All questions of life and death are answered in this science-ridden age in terms of the known laws of these sciences, and it is forgotten that there is in men something which defies materialistic explanation. Materialism, which in some form or other, has always existed in the world, has now gained great status, and is the most popular outlook today on

account of a false belief common to mankind that it is the only outlook which science supports.

According to Materialism man is a product of nature and is wholly governed by mechanical laws. There is nothing like a soul or spirit in him. Even the mind is not anything immaterial. Consciousness and other mental processes and activities are either movements or products or functions of the brain and the nervous system. Life and consciousness are accidental and recent phenomena in the history of the world, originating out of material forces, which have been in operation for an incalculable period of time. In such a material and blindly and mechanically working universe there is no place for God, and there is no possibility of survival or immortality. An individual is nothing more than an effect of natural causes, heredity and environment. He has no power and freedom to carve out a destiny for himself. There is no final meaning or purpose of life which is governed by blind forces of nature. Individual life begins with birth and ends in death. Nature is indifferent to life, which it produces in abundance and destroys ruthlessly. Serious consequences have followed from this doctrine. It has made man sceptic about all that was formerly regarded as valuable, sacred and holy. It has exploded belief in the spiritual ends of life. It has crushed faith in Truth, Goodness and Beauty, as the highest values of life. It has deprived man of the support of the Deity, and of the hope of Heaven. Under its influence man now thinks of truth as expediency, of goodness as prudence, and of beauty as attractiveness. Under its spell man insists upon "the right to the unfettered enjoyment of the pleasures of the moment." Spiritual life is regarded as an escape, religion as an opiate, and mystic experience as an illusion. There can be no doubt that our present day malady is due to the prevalence of such an outlook on life.

What then is the remedy for the malady from which the world suffers today? Certainly not bidding a good-bye to science and technology. It is not possible nor even desirable. Scientific method, the great knowledge that science has given us, and the

technical skill and gadgets we now possess are great achievements of human intellect ; and we should be proud of them. We should make greater and greater use of them, particularly in India which lags behind other countries in having them. What is actually to be given up is the narrow incomplete and wrong outlook which has been built on the basis of a few physical sciences.

Will the revival or acceptance of any one or all of the historical religions help ? Certainly not. Simply because there is much in all religions which is in conflict with the findings of science, and which the modern man cannot accept and believe. Most of them are based on wrong concepts of history, geography, physics, chemistry, geology, astronomy, biology, psychology, anthropology, and sociology. Most of them require blind faith in prophets and scriptures. Most of the doctrines of the same religion are self-contradictory, and all the religions are at variance with one another on the major issues of life. They need not be revived in their old historical forms, simply because they do not suit man in the age of science. A scientific age needs a scientific religion, which is yet to be born.

Can the ethical teachings of great saints and sages of history help the modern man ? Certainly not. Most of them are merely exhortative, self-conflicting, unsystematic, unnatural and irrational. Often they are based on wrong religious beliefs or on unproved or unprovable assumptions. Their demands are impracticable ; and often they demand too much of sacrifice from the individual without giving any satisfactory reason. Modern man needs a scientific, secular and rational ethics based on complete scientific data about man.

(To be continued)

THE WAY TO SRI KRISHNA

DR. M. HAFIZ SYED, M.A., Ph.D., D.LITT.,

It is the innermost desire of every aspirant and devotee of God to attain His nearness and in due course be united with Him. Every religion, ancient or modern, has laid down certain methods of approach to Him. Some religions have enjoined the need of a mediator, a link between God and man and in order to attain Him one has to surrender himself heart and soul to the mediator before one is blessed with direct contact with the Divine. Lord Sri Krishna, the highest manifestation of the Divine according to Hindu tradition, is directly accessible to all earnest devotees. The only condition laid down by Him is complete self-surrender and utter devotion to Him. He says, "He who constantly thinketh of Me, not thinking ever of another, of him I am easily reached, O Partha, of this ever-harmonised yogi. (VIII. 14)

Knowing human nature full well as He does, He knows its limitations, drawbacks and shortcomings. For, a large number of people having trodden the path of fourth-going (Pravrtti marga), it takes time for them to become familiar with the laws and conditions of the path of Return (Nivrtti Marga).

The blessed Lord has advised them to march forward on their adventure step by step. The aspirant is expected to do everything as an offering to him. The Lord says, "Whatsoever thou doest, whatsoever thou eatest, whatsoever thou offerest, whatsoever thou givest, whatsoever thou doest of austerity, O Kaunteya, do thou that as an offering unto Me." (IX. 27).

Thus he is gradually accustomed to hear Him in mind and develop devotion to Him by means of offering and service. Further the Lord says, "he who offereth to Me with devotion a leaf, a flower, a fruit, water, that I accept from the striving self, offered as it is with devotion." (IX. 26).

The easiest and the best way to Him, as assured by the Lord Himself, is through sheer giving, complete self-surrender to His Feet, unreservedly and unconditionally, not through any complicated rites or ceremonies. The disciple must reverse the process of grasping, which builds up a personal self, and strive to give away all that he has, including his petty self. Instead of expecting to get anything from Him in the form of earthly gifts he should desire the God and not anything that He can give him.

The first step in this process of self-elimination is symbolic gifts of leaves and flowers and fruits but afterwards the gift of self, the consecration of all acts to Him. Nor should any one think that his gifts are not accepted by the Lord. As a matter of fact all gifts, however small and insignificant, if offered with love and devotion, are acceptable to Him, because all giving as an offering is a breaking down and weakening of the barrier which cuts off the soul from the wide life outside. The smallest act of giving is a step upon that Path, and leads the aspirant by easy steps to that sublime stage where the whole personal life, with all its acts and thoughts and feelings, is dedicated to the service of the one in all, where acts can bind no more since the personal self is eliminated and nothing remains that can be bound by them.

The way to Him is clearly pointed out by the Lord Himself, but each has to tread it by himself. No special privilege can be found upon this Path. He who seems to climb with glorious ease today is not a favoured darling of the gods ; but one who reaps the fruit of arduous struggle undergone yesterday.

There is no other way to Lord Krishna than giving of the self to Him in service ; by his own efforts each must climb the Path, as the Blessed Lord Krishna dwells equally in every human heart. None who seeks to offer up himself can be refused. Though he must climb in weary loneliness, striving alone with his own heart, yet is that loneliness a mere illusion ; for there stands unseen his eternal Friend and inmost Self. Therefore, is it said that even if the most sinful of men turns to Him and serves Him with undivided heart, he too must

be accounted righteous ; for he too has entered on the Homeward path. Once the resolve is made and solemnly kept to act in future for the higher and not the lower self, progress on the Path is certain. It should be borne in mind that while treading the path the aspirant will have to face many a failure ; yet once the link with the Divine Self has been established he cannot fall again into the utter darkness, because something has been awakened within him, which will never let him rest again in matter, and though at times he may even fight against it, the inner pull will again and again be felt and the blessed Lord's words will be fulfilled, who says, "Know thou for certain that my devotee perishes never."

It should be remembered that the Atma dwells within the heart of all and therefore this Path is open to all without the distinction of race, caste or sect. The Path of Vedic ritual needed a wealth of learning and therefore was inevitably closed to women and Sudras. This path calling only for sincere self-giving needs no scriptural or philosophic learning and so is open to all.

In conclusion the most merciful Lord teaches us at the end of Discourse IX : "On Me fix thy mind ; give thyself in love to Me ; sacrifice to Me ; prostrate thyself before Me ; having thus united thy whole self to Me, with Me as thy Goal, to Me shalt thou come."

GOD INTOXICATION

SWAMI RAMDAS

My Beloved's kindness came to me like the cool rays of the moon. It released me from bondage and healed my sorrows. What a magic touch ! What miraculous change !

Now life flows in a blissful stream, glistening with the light of the Beloved. What a vision ! The worlds are the forms of my Beloved. He is at once visible and invisible—the Supreme being and non-being.

I wished Him to stand before my inner sight as an image of unsurpassing beauty—smile on the face, compassion in the eyes, and love pouring out of Him. Lo ! He is there before me, the enchanting Lover of my heart.

When the thought of thee like a star sparkles in the sky of my mind, I am lost in Thee. The rapture I feel then is beyond compare. This rapture turns me finally into Thyself—raising me beyond all duality.

Thy glory—my Beloved, is seen everywhere. All objects and beings sing pæans to Thy greatness. I go near a tree and its green leaves chant of Thee. I look up to the sky, Oh, it opens out the blue veil and reveals Thy fascination.

A child comes to me—the little living figure of Thy love and I am charmed. I clasp it in my arms. I lean my head touching its head. Thrills and thrills ! It talks dropping sweetness at every word. Honey is insipid in comparison. O God of love, all hail to Thee.

The enthralling strains of music that fall into my eager ears is surcharged with celestial symphony—the essence of Thyself—my life and soul. Thy feet, O my Beloved be ever on my head and I melt away in Thee.

I tell the scented flower that nods its head in the mild breeze—
 “Blessed art thou little beauty, for thou revealest the face of my
 Beloved.” It looks up and seems to smile.

Holiness and sanctity permeate all. My Beloved is everywhere.
 The entire nature is He. No God for me apart from nature. He
 covers all and is above all. I sought Him and became one with Him.
 I loved Him and became love itself. He shines in my eyes, my breath
 is fragrant with His breath. I move, because He moves. He is
 wonderful.

I prayed to be mad of Thee. The prayer granted has become
 so. Thou hast totally possessed me. Now I have none but Thee.
 My entire being is vibrant with Thy love, light and bliss. Truly, I
 am no longer myself. I am Thyself. One alone exists—either Thyself
 or myself.

ANDĀL

DR. T. M. P. MAHADEVAN, M.A., Ph.D.,

Professor of Philosophy, University of Madras.

Among the Alvārs, Andāl was the best exemplar of bridal mysticism, being a woman herself. The æsthetic approach to God is difficult but alluring. The Upanisads describe Brahman as the supreme Bliss (*parama-ānanda*) and as essential sweetness (*rasa*). The *bhakti-sāstras* speak of God as *Manmatha-Manmatha* (Cupid of Cupid) and *Bhuvana-Sundara* (the most beautiful in all the worlds). Many of the mystics adopt the way of bridal love and look upon God as the Bridegroom. In their mystic life are enacted all the incidents of the love-play—courting, engagement, marriage, temporary separation with its attendant pangs, and re-union. Although in this love-game there is not the distinction of male and female among the devotees—for all are females in relation to the only Male, God—yet the women devotees have a distinct advantage, as bridal mysticism is more natural to them. And, among the brides of God, Andāl is pre-eminent because she gave herself to God, totally and unconditionally, right from her childhood, the age of innocence.

Srivilliputtūr is a township, about fifty miles south-west of Madurai. It was founded by two brothers who were hunter-chieftains, Villi and Kantan. According to a legend, they cleared the jungles and created the town of Srivilliputtūr (the new town of Villi) in obedience to a divine command. This became the birth-place of two vaishnava saints, Visnucittar who came to be known as Periyālvār, and his daughter, Andāl.

Visnucittar (one whose thoughts were centred in Visnu), believed to be an incarnation of Garuda, was born in a Brahmin family whose members were dedicated to divine worship. Of the various incarnations of Visnu, he preferred the *Kṛṣṇāvatāra*; and of the different attitudes (*bhāvas*) in *bhakti* he adopted mostly that of

the mother towards her child (*vātsalya-bhāva*). While he was thinking about the form his service to the Lord should take, he was struck by the incident in the life of Sṛī Kṛṣṇa relating to His gracious acceptance of the flower garland offered by Mālākārā while he was on His way to meet King Kamsa in Mathurā. So, Viṣṇucittar decided to rear a flower garden with a predominance of basil plants (*tulasī*), dear to Viṣṇu, and offer garlands everyday to the Lord in the temple at Śrīvilliputtūr. He was not learned in the *Sāstras*. The Lord appeared in his dream, one day, and commanded him to go to Mādurai and establish the supremacy of the Vaisnava faith in an assembly of the learned convened by the Pāṇḍya king, Sṛī Vallabha Deva. Viṣṇucittar did as he was ordered to, and was declared victor in the debate. The king honoured him with presents ; everyone accolled him as the greatest teacher of the time. The Lord Himself appeared seated on His mount Garuḍa and accompanied by Lakṣmi and the Celestials and blessed Viṣṇucittar. The saint was overwhelmed at this grand and unique sight. But soon a fear overtook him. He became concerned about the Lord's safety. The parent in him made him feel that the Lord was running a risk in making His appearance in the world. This is by no means a safe world. Some injury might be done to the Lord's beauty, might, and glory. So, the saint blessed the Lord, even as a parent would his or her child. He sang the song of blessings called the *Tiruppatandu* in which he invited all men to join him in the Benedictory. As Viṣṇucittar had the competence to bless the Lord, he received the appellation, 'Periyālvār'.

After the Mādurai victory, Periyālvār returned to Śrīvilliputtūr and resumed his services at the temple. As he was digging in his garden, one day, preparing the *Tulasi* beds, his attention was drawn to the appearance of a mysterious child. It was a fair young girl, bigger than a baby, lying under a *tulasi* plant. She was a gift from Heaven to Periyālvār, even as Sitā was to King Janaka. The saint took the child to his childless home, named her Godā, and brought her up with tender care and loving devotion. It was Godā that came to be known as Andāl later on. The date of her birth, according to tradition, is the ninety-seventh year of the *Kali* age. Modern scholarship assigns her to the middle of the seventh century A.D.

Godā grew up to be a fine and accomplished girl. Being an incarnation of Bhu Devi, her love spontaneously flowered towards Visnu, her Lord. Periyālvār contributed his own share to the flowering of Godā's devotion. He performed for her the purification ceremonies, initiated her into the secret doctrines of Vaisnavism, and taught her to appreciate and value the greatness of Visnu.

Even from her childhood Godā considered herself to be the bride-designate of the Lord as he appears in Srirangam. As she grew, she had no other thought except to prepare herself in everyway to become the consort of Sri Ranganātha. Everyday she used to deck herself with the garlands her father made for the worship of the Visnu image of the temple at Srivilliputtur, look at her own reflection in the mirror, and satisfy herself that she was equal in beauty to the Lord. Then she would remove the garlands and place them as before in the baskets. Periyālvār would take them to the temple, not knowing that they had been used by his daughter, and offer them to the Lord. But one day he came to know of what appeared to him then to be an act of sacrilege on the part of his daughter, reprimanded her, and did not take the garlands to the temple. The Lord appeared to him in a vision and asked him why he had not brought the garlands that day. When the saint explained, the Lord told him that the garlands worn by Godā were extremely dear to Him, that to offer them to Him was no sacrilege, and that such an act was profoundly holy. Periyālvār conveyed the Lord's command to his daughter, and thereforth he himself made her wear the garlands before taking them to the temple. Now that he knew the identity of Godā as the Divine Mother, he gave her the name 'Andāl' (the Redeemer of the world). As she wore the garlands and gave them to the Lord, she came to be called 'Sudikkodutta-nācciyār'.

As Andāl grew in age, her love of God also grew. Her wakeful hours were filled with thoughts of marrying the Lord. Her dreams were centered on enjoying His company. Her vivid imagination took her back to the times when Sri Krisna disported Himself with the *Gopīs* of Brindāvana on the banks of the Yamunā. She herself became a *Gopī*, rising up early in the morning, rousing her companions from

sleep, bathing in the sacred river, and going to Nandagopa's house to pay homage to the Lord of her heart. In the month of Mārgasirsa (Mārgali), she observed the *nāvai-nōnbu*, invoking the grace of Kātyāyini so that she might wed her chosen Lord. She sent her prayers to Kāma, the God of Love, to prepare her for God alone and to unite her with Him.

Anxiety took possession of Periyālvār when he saw his daughter's God-madness increasing. Marriage, he thought, would cure her disease. Gently he broached this subject to his daughter, one day, and asked her whom she would like to wed. Sternly she replied that she would rather die than consent to marry a mortal. She had resolved to wed the Lord, and nothing would make her relinquish that resolve. There are a hundred and eight temples dedicated to Visnu; in each of these there is a special manifestation of the Lord. Of these, whom would Andāl wed? Periyālvār was explaining to her the nature and glory of each of the manifestations. As he was giving a description of Sri Ranganātha, Andāl's heart melted, tears of joy trickled from her eyes, a thrill passed through her body, she became enchanted. It was evident that her heart was set on Sri Ranganātha. But how could this marriage take place?

Lord Ranganātha appeared in a vision to Periyālvār and allayed his fears saying that the miracle would happen, that He would Himself arrange for the marriage. To the temple priests of Srirangam there came the command from the Lord, asking them to go to Srivilliputtur with all the temple honours and bring Andāl the bride elect, to Him. Accompanied by devotees and priests and led by Periyālvār, Andāl was taken in a palanquin to the Srirangam temple. As she entered the *sanctum sanctorum* and beheld the entrancing Beauty of the Lord, she was irresistibly drawn towards Him. Walking upto the Deity reclining on the Sesa bed, and mounting up the bed itself, she stood by the side of the Lord. And lo! she disappeared into the Lord, getting absorbed in Him. Everyone present there was amazed. Periyālvār shed tears of joy and sorrow—joy at his daughter's union with the Lord, and sorrow at his own separation from her. The Voice of God was then heard, telling Periyālvār that he had now

become God's father-in-law, and asking him to go back to Srivilliputtur install the images of Sri Ranganātha and Andāl, and worship them with fervour and devotion, as also to continue his habitual mode of service at the shrine of Srivilliputtur.

Tiruppāvai and *Nācciyār-tiru noli* are the *prabandhams* composed by Andāl. They form part of the First Thousand. Both of them are lyrics portraying the varying moods of the lady in love, ranging from utter dejection and despondency to hilarious mirth and serene joy born of union with the beloved. Only, here, the Beloved is the Lord Himself.

In the month of Mārgasīrsa, maidens observe a ritual called *Pāvai-nōnbu* which consists in the worship of Kātyāyini early in the morning everyday with a view to obtain proper bridegrooms by Her grace and to secure the welfare of all beings in the land. The *Gopis* of Brindāvana adopted this ritual in order to gain union with Sri Krishna. In the *Tiruppāvai*, Andāl employs this allegory and gives expression to the *gopis'* devotion to and love for Sri Krishna, identifying herself with one of them. She offers herself in this lyric as a self-gift to the Lord, resolves to become His slave and do His bidding, and asks for nothing more than to be accepted. In the thirty verses of this poem corresponding to the thirty days of the month, the sports of Sri Krishna, His boyhood pranks, and His deeds of valour are extolled; and the burden of every verse is that He should receive the love of the devotee-soul.

God-love is the theme of the *Tirumoli* also, which is a longer poem. Every word of this lyric bespeaks of the boundless love of Andāl for the Lord whom she longs to wed. All that a love-lorn maiden would do, she does in order to gain union with Sri Krishna. She prays to the God of Love, Kāma, to intercede on her behalf and join her with her Lord. She sends love-messages to Sri Krishna through her companions, and even through birds and clouds. She complains to the elements that her Lord has turned a deaf ear to her appeals. She has pleasant dreams of marrying the Lord and living happily with him. After waking up, she shares her dream-experiences with her

friends. She implores them to take her to the place where her Lord is. She roams about without rest, asking all and sundry if they had seen her Lord. When they reply that they had seen Him in Brindāvana, she takes heart and continues her journey. Andā's all-consuming love is picturesquely and tenderly expressed in this beautiful poem which gives us a grand insight into bridal mysticism.

REMINISCENCES

ATMANANDA

(2)*

After I had had my first talk with Mataji I never ceased to marvel at the extraordinary ease and naturalness with which She had exploded my problem. Where there had been an almost constant dilemma, there was now a straight path. It was as if an open door had been shown to me : as I then saw, it had always been there, but I had not noticed it until she pointed it out. She had uttered just a few simple words, nothing particularly striking or unheard of, yet the effect was quite out of proportion. It may perhaps be likened to the miracle of electricity : by the mere pressing of a button a whole town can be lit up. Mataji's words evidently are not just ordinary words, but vehicles of power and light that open up one's understanding, that bring about definite changes in the person to whom they are addressed. The mind did not cease from wandering, but it ceased from worrying : there suddenly was nothing to worry about. I could perceive the next step, and full confidence had been awakened in me that I would always see the next step as I walked along. A new life had begun.

* See Ananda Varta Vol. VI/4, p. 325.

I conceived an overwhelming desire to be able to talk to Mataji without the help of an interpreter, to find out more about Her and Her teaching, which seemed so simple and yet again so very very subtle and far-reaching. I thus began to devote every free minute to the study of Hindi.

Bengali would have been more satisfactory, since it is Mataji's own language, but I already knew the Hindi script and had an elementary knowledge of the language, so, being impatient by temperament, I naturally chose the quicker way. It took me about a year of strenuous effort to understand well what Mataji said in Hindi and to talk to Her without help. No sooner had I achieved this than Mataji would quite often call me to translate for foreigners and sometimes for South Indians. I thereby got a unique opportunity to witness many private interviews with people of greatly varying background. This enabled me to get first-hand experience of the great universality of Mataji's teaching, of its innumerable aspects and facets: I could see for myself how She modified it to appeal to each person's nature, conditioning and need of the moment—and yet She never stepped it down. My desire was being fulfilled: slowly and gradually I got a certain grasp of what Mataji taught, by Her Presence as well as Her words.

Translating private conversations moreover gave me the chance to get to know intimately sadhakas from various countries, to get an insight into their problems, their approach. Fellow-travellers who meet on the way can often learn from one another.

My efforts were thus rewarded a millionfold, in fact, tenacious as they had been, they were negligible compared to what I had gained.

*

*

*

In November 1945 I wanted to spend my Divali holidays with Mataji. I had never before stayed in any of Her Ashrams. Mataji was to be at Vindhyachal on that occasion. The war was not yet over, and, being an 'enemy alien', I could not leave Varanasi without obtaining a special police permit. I applied and was wondering

whether the permit would reach me in time. How great was my joy and amazement when I received the reply that I did not require any more permits! Henceforth, I was free to travel where I pleased within India, provided I kept the police informed of my itinerary. Ever since the beginning of the war in 1939 my movements had been severely restricted. I had had to apply giving valid reasons every time I wanted to leave Varanasi even for a single day. Permits had often been granted, but by no means always. Was it a coincidence that the moment I had no more desire to go anywhere except for the sole reason of being near Mataji, I was suddenly free to go wherever I liked?

At Vindhyaachal *Kali Puja* was celebrated. I had never before witnessed a *puja* of this kind, nor was I used to staying up all night. In those days the crowds that thronged round Mataji were not so formidable as they are now. Besides, being a newcomer and a foreigner at that, I was readily helped to a good place right in front, from where I could watch Mataji and every detail of the *puja*. Mataji was present throughout the night in the room where the *puja* was being performed. She seemed to be keenly alive to everything that happened. I observed Her closely and was fascinated to see Her face change continually. A whole drama appeared to be enacted on Her features. She looked not only radiantly beautiful but also extraordinarily young that night—I could have sworn She was not a day older than 16 and yet I knew that She had been born in 1896, nearly fifty years before. Was it a human being or goddess sitting there in front of me, I mused. I cannot claim to know how a goddess looks, but surely this was not the countenance of a human being.

Another peculiar thing happened to me that night. My own mother died when I was just two years old and although I had seen a number of photos of her, much as I tried, I had never been able to imagine how she had looked. This puzzled me much, especially in my childhood. During that *Kali Puja* the thought suddenly flashed through my mind: I have seen this face before, long ago—Oh, now I know how my mother looked: this (Mataji) is my mother." It was a strange experience, inexplicable, which left a deep and lasting impression, unforgettable.

When the *puja* was over, I was told that it was 3 a. m. *Three A.M.*? Was it possible? We had been watching since 10 p. m. Had I really sat glued to the spot for five long hours? I did not feel sleepy even when I got up and I could not fathom how the time had flown so quickly—5 full hours! It seemed quite incredible. I went to my room and lay down. I had not yet fallen asleep when someone knocked at the door, calling my name. It was Sri Gurupriya Devi, holding an *asana** in her hand: "Mataji sends you this," she said. It was just 4 a. m., the time when at the Ashram we are supposed to rise for meditation. 'How very subtle of Mataji, 'I thought, 'to present me with an *asana* in this memorable night and at this hour, to remind me no doubt that this is not the time to sleep but to sit in meditation.' I went outside to thank Her. Mataji had not gone to rest, I found Her busy, surrounded by people. She smiled at me. "You were feeling cold, sitting without an *asana*," She said. The *asana* is still with me, but with the years it has become badly worn.

*

*

*

It was probably in 1947 when Thompson received a letter from a friend in Pondicherry, recommending an old French gentleman to him, who had spent the greater part of his life in Africa and had now come for a short holiday to India, the land of his dreams. He wished to spend a few days in the holy city of Varanasi; would Thompson kindly assist him and show him round, since the old man did not know much English and of course not a word of Hindi. T. did what he could for him. However when he found that the old gentleman was a serious aspirant, who had practised meditation for about 30 years with the help of Swami Vivekananda's books, he said to him: "What will you gain by all this sight-seeing? The one whom you really ought to meet is Sri Sri Anandamayee Ma." The old man had never before heard about Mataji, but when he was told more about Her he was only too eager to have Her *darshan*. There was only one difficulty: Mataji was not in Varanasi at that time and the gentleman's visa was about to expire in a couple of days. "I cannot possibly

* A small carpet used as a seat for meditation or worship.

risk to stay on," he said, "I must go to Delhi at once to have my papers put in order and then leave India, or I shall get into serious trouble with the authorities." But T. was not the man to listen to such arguments. "Nonsense", he retorted with vehemence, "visas, police, authorities, etc./etc.—all these are creations of the mind. The moment a human being attends to reality all these phantoms lose their power, they simply cease to exist for him. You need not worry at all about those formalities, rest assured that nothing will go wrong. You cannot leave Varanasi now. Mataji is expected here in a few days, you will have to wait." T. could be fierce in his determination on occasions and the old man had not the courage to contradict him. Moreover, he felt utterly helpless at Varanasi without T's assistance and guidance. So he obeyed.

He was waiting at the Ashram when Mataji arrived. Once he had seen Her and She had glanced back at him he could not take his eyes off Her. Fascinated, for hours' together he stood speechless on the terrace over-looking the Ganges, with tears trickling down his cheeks, unaware of the passage of time. When late at night he got back to the Rama Krishna Mission, where he was putting up, he found the gate locked. With difficulty he roused the door-keeper. Everyone was asleep and he had to go to bed without his dinner. The next few days he spent at the Ashram. He had one or two private talks with Mataji, which I had the privilege of translating into French with T's help. Mataji asked the old man when he would return to India. He replied: "I am afraid there will be no more chance of that. I have come with considerable difficulty even this time and I shall not get permission again to take maney out of the country in which I live. Besides I am old." (He was nearly 70). Mataji made no comments. The gentleman left and he really encountered no difficulties due to having overstayed his visa.

Soon after reaching his destination he began to write letter after letter, all of them dealing with the same theme in endless variations: He could not bear the thought of living for the rest of his life far away from Mataji and from India. By hook or by crook he would have to return. 'Where there is a will, there is a way'—he

would manage to come somehow, sooner or later, the sooner the better. Lo and behold—he quickly discovered a way. India had just gained political independence and every country had to start an embassy or a consulate in New Delhi. In no time the old gentleman secured a post of some sort at his country's embassy in New Delhi. He consequently was not only granted a visa but also permission to bring his money to India.

When he arrived he went straight to Mataji and subsequently followed Her about wherever She happened to go for some two or three years. Notwithstanding his advanced age and the fact that he had been used to a very different and settled kind of life, he did not seem to mind hardships and discomforts; he was blissfully happy, having found what he had longed for most of his life. Later however his health deteriorated. He left India, only to come back a third time. But his enthusiasm had waned or perhaps he had grown too old. I have lost track of him and do not even know whether he still dwells in the land of the living.

MATRI LILA

(15th January—15th April, 1959.)

After nearly two week's stay at Jhalawar Mataji returned to the New Delhi Ashram for a week end on January 16th and then proceeded to Varanasi, breaking journey at Allahabad for a few hours. On the 23rd night Mataji reached the Rajgir Ashram which is a solitary place. Rajgir (Rajagriha) in Behar has been famous since the time when the Lord Buddha walked the earth. He visited the ancient Rajagriha several times for longer and shorter periods. It thence became a Buddhist place of pilgrimage. Apart from this it has been blessed by nature with hot springs that are said to have cured thousands of patients of all kinds of ailments. The Ashram at Rajgir was built fairly recently, but even before it came into existence, Mataji used to visit Rajgir now and again, putting up at one of the *Dharmasalas*.

On February 5th Mataji went on to Patna. Sri N. Bakshi, I. C. S., drove Mataji to Patna in his car. After paying a short visit to his house, Mataji proceeded to Prof. S. Choudhury's house where She spent the night in the family temple.

A party of devotees from Varanasi headed by Didima joined Mataji at Patna from where everyone entrained for Calcutta arriving at the Agarpara Ashram on the 7th morning. Since it was known that Mataji would most probably spend more than two weeks at Agarpara and would moreover move to the city during the later part of Her stay, the rush of devotees was not quite as great as usual in the beginning, since Agarpara is far out of Calcutta proper. Among the regular visitors were a number of Europeans and Americans, some of them belonging to the *Self-Realization Fellowship* that was started by the late Swami Yogananda. Their Ashram at Dakshinেশ্বর is not far from ours at Agarpara.

Mrs. Anitra Lucander, a Finnish paintress of repute, stayed in the Agarpara Ashram for a week, and then flew back to her country.

The Ananda Varta and the few English books that have been published about Mataji have found their way even into the countries

of the midnight sun. Mrs. Lucander had read them in her home and was ever since eager to meet Mataji face to face. Spending X'mas at Bethlehem she alighted in New Delhi early in January. As luck would have it Mataji happened to be there and within a few hours of her arrival she was able to have Mataji's *darshan*. She remained in the Chandraloka Ashram for a couple of days and later followed Mataji to Jhalawar, from where she went to visit the Ajanta and Ellora caves. Halting in our Ashrams at Vrindaban and Varanasi enroute, she joined Mataji again at Rajgir. She felt quite at home in India and we hope to welcome her soon again.

On February 12th, *Vasant Panchami* day, Saraswati Puja was celebrated with great rejoicing at the Agarpara Ashram. It has become almost a national festival in Bengal.

On February 18th Mataji stayed for one night in a room specially constructed for Her use in the house of Sri K.N. Banerjee, Rtd. Asst. Income-tax Commissioner, Bengal. The next morning She proceeded to the residence of Sri D. K. Nag, the son-in-law of the brother of Sri Jatish Chandra Guha. Their whole family are amongst Mataji's oldest devotees. The opening ceremony of Sri Nag's house was performed in Mataji's presence. Here a large number of people, who were unable to travel all the distance to Agarpara, had the golden opportunity of Mataji's *darshan*.

On the morning of February 24th, Mataji left for Burdwan, which is about 60 miles from Calcutta. There She spent six or seven hours in three different houses of devotees and left for Varanasi the same night, reaching on the 25th morning, only to leave Dehradun again on the 28th of February.

As early as in September 1957, the construction of two temples had been begun in the grounds of the Kishenpur Ashram, but left uncompleted for about a year. Only recently the building work was at last brought to a successful end and the consecration of those two temples, as well as, of a small Shiva shrine at "Kalyanvan" took place on the Shivaratri day, March 7th, in Mataji's presence.

Just as with everyone of our Ashram and the temples located within the precincts of those Ashrams, there is a long and interesting history behind those temples which we hope to publish in details in our next issue.

On March 9th Mataji paid a short surprise visit to the New Delhi Ashram and the next day motored from there to Vrindaban, where She remained for the Holi festival on March 24th. Elaborate accounts of this festival have appeared in the pages of this magazine before. A devotee of Mathura had arranged for a Bhagavata Saptaha there, which commenced on the 12th.

On March 25th Mataji left for Delhi and from there the next day by car for Patiala at the invitation of Rai Bahadur G. M. Modi of the Modi Industries.

After five days at Patiala Mataji and the whole party proceeded to Hoshiarpur, where everyone stayed at the Sachchidananda Ashram till April 6th. The next day and night were spent at the Savitri Devi Ashram, Jullundur. On the 8th April early morning Mataji and Her large party reached Hardwar. The same afternoon Mataji motored to Ramnagar, Rishikesh, the site for the next *Samyam Mahavrata*; after a short while, the car took Her on to Kishenpur, Dehradun, where She had three comparatively restful days. On the 11th afternoon She was back at Rishikesh. On April 13th Mataji accepted a special invitation to the Sapta Rishi Ashram, Hardwar, where Sri Jawaharlal Nehru addressed an enormous gathering, while Mataji sat by his side on the special dais. Sri Nehru took this opportunity of paying his respects to Mataji after a lapse of about seven years and having a few words with Her.

On April 14th Didima's (Sri Swami Muktananda Giri's) *Sanyasa Utsava* was celebrated by a programme that continued without interruption from early morning till late at night. The celebration took place at Atma Vijnan Bhawan, Ramnagar, Rishikesh, a truly wonderful spot on the banks of the Ganges, solitary and far removed from the hustle and bustle of modern civilization. From April 15th the Ninth *Samyam Mahavrata* will be observed in the very same place.

We hope to report in detail both about the *Samyam Mahavrata* as well as Mataji's 64th Birthday celebration at Kishenpur in the next issue of Ananda Varta.

NOTES AND COMMENTS

It is indeed a matter of great pleasure and satisfaction to all of us that the magazine is beginning its seventh year with this Birthday Number. But we are really afraid that, unless the number of subscribers is substantially increased immediately, continued financial handicap may necessitate some deterioration in the existing quality of the journal. Each of our subscribers is, therefore, particularly requested to enlist at least *five* new subscribers among his friends and relations.

* * *

With due consideration to facilities for packing etc. and lesser chance of damage in postal transit, the size of the magazine is being slightly reduced beginning with this issue. But it is guaranteed that readers will find more pages to read in future than before.

* * *

Due to exorbitant rise in the price of paper, we have been compelled to increase most reluctantly the annual subscription of the magazine to Rs. 5/- (including postage) beginning with this volume.

* * *

Several bound copies of Volume VI are now available. The price of each volume is Rs. 8/- only (excluding postage & packing).

* * *

We had mentioned in the last February issue that all who had the privilege of coming in close contact with Ma know very well how difficult it is to give any definite information about Her programme. The 64th Birthday Celebration which was proposed to be held at Jamnagar will now be held at our Kishenpur, Dehradun Ashram. Ma is expected to stay there till the end of May, 1959.



SIXTY-FOURTH BIRTHDAY CELEBRATION OF SHREE SHREE MA

We have much pleasure to announce that the sixty-fourth Birthday Celebration of Shree Shree Ma will be held from 3rd to 26th May, 1959 at Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Kishenpur, Dehradun. It is expected that Ma will grace the occasion by her Divine presence.

The *Tithi-Puja* will be held on 25th night (26th according to the English Calender).

All are cordially invited to attend and participate in the celebration.

President,

SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA.

VARANASI.

*Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.*

নতুন প্রকাশিত হইল

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

দশম ভাগ

শ্রীগুরুপ্রিয় দেবী প্রণীত

মূল্য—দুই টাকা ।

শ্রীশ্রীমায়ের অপূর্ব দিব্যজীবনের বিষয়ে নানা কথা, সূক্ষ্ম দর্শনাদির বিবরণ, উড়িয়া বাবার দেহত্যাগ, সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি, যজ্ঞকুণ্ডে নানা অলৌকিক দর্শনাদির বিবরণ, মাকে লইয়া সূক্ষ্মদেহীদের আনন্দ কীর্তন, হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ, কাশী আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা ও অন্নপূর্ণার নূতন মন্দির স্থাপনা, পুরীতে মায়ের শরীর ত্যাগের উপক্রম, মোরভি, মণ্ডিরাজা, কুলুভ্যালি, যোগেন্দ্রনগর, নরেন্দ্রনগর, আনন্দকাশী প্রভৃতি স্থানে মায়ের ভ্রমণলীলার কাহিনী লইয়া এই ভাগের রচনা ।

